ছোট্ট পমির অভিযান

হেমেন্দ্রকুমার রায়

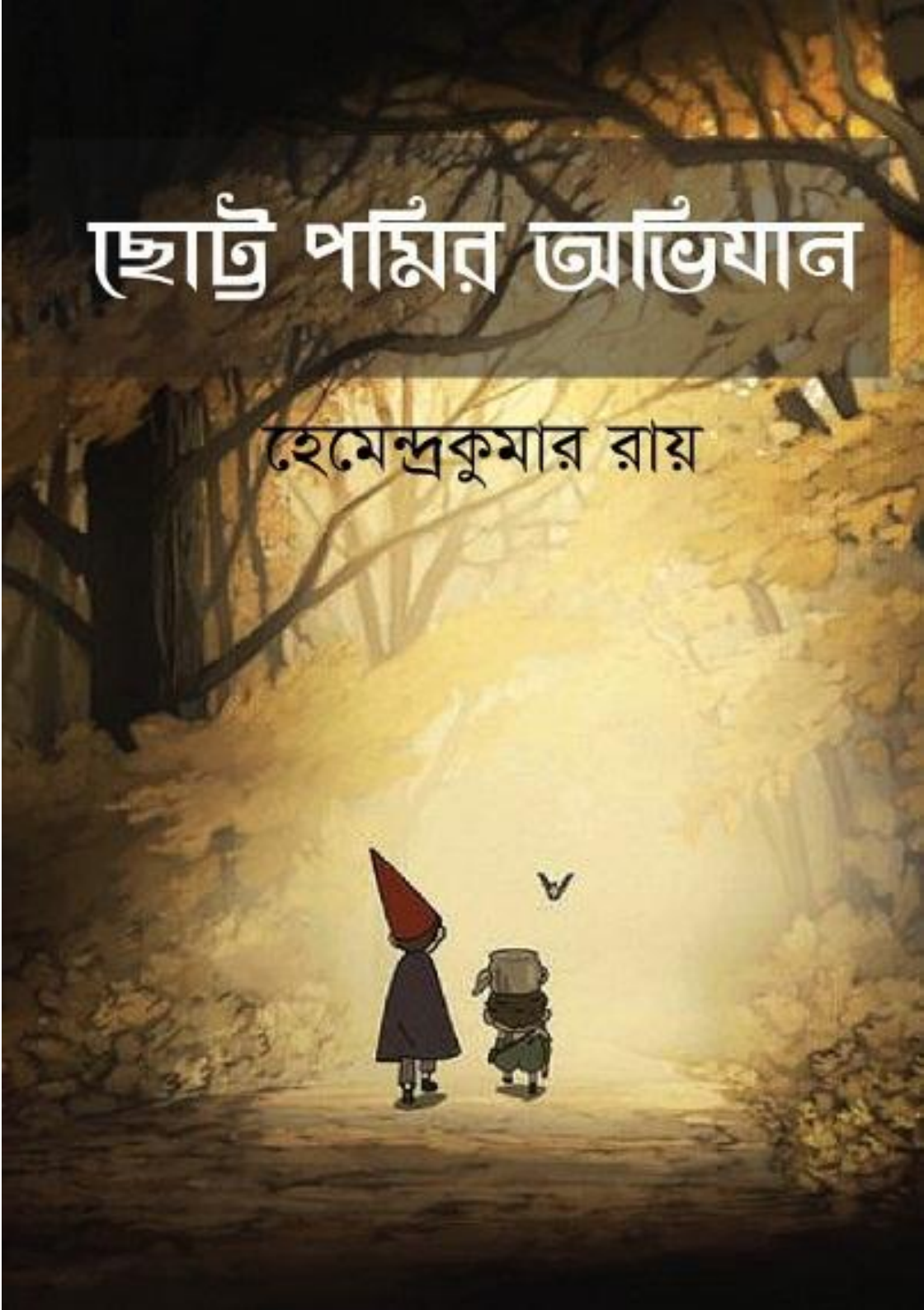

ছোট্ট পমির অভিযান

হেমেন্দ্রকুমার রায়

ছোট্ট পমি জানলে তার ভালোবাসার কেউ নেই

আসল নাম প্রমোদ। কিন্তু তার ডাকনাম ছিল পমি। পমির বয়স বড়ো কম নয়।—পুরো ছয় বছর! এবং এর মধ্যেই সে জেনে ফেলেছে দুনিয়ার অনেক কিছুই।

ধরো, সে জানে যে শীতে হাত কনকন করলে পকেটের ভিতরে পুরলেই হাত গরম হয়ে যায়। সে আরও জানে কোনটা সাদা আর কোনটা কালো রং। এবং এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত অনায়াসেই সে গুনে ফেলতে পারে; কিন্তু আরও বেশি এগুতে পারে না, কারণ তার পরেই মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে আসে। কেবল তাই নয়, সে নিজের জামাকাপড় নিজেই পরতে পারে। এসব শিখতে তাকে কম বেগ পেতে হয়নি; কিন্তু উপায় কী, জন্মেই কেউ তো আর প্রফেসরের মতন জ্ঞানের জাহাজ হতে পারে না।

পমি আরও কত কী জানে। সে জানে, বড়োদের দেখলেই নমস্কার করা উচিত; কেমন করে স্নান করতে হয়; কেমন করে খাবার খেতে হয় আর কেমন করে হেঁচে ফেলতে হয়। বাড়িতে অতিথি এলে যে, ভিজে বেড়ালটির মতন শান্ত হয়ে থাকতে হয়, এটাও তার জানতে বাকি নেই। অবশ্য তাদের বাড়িতে অতিথিদের দেখা পাওয়া যেত খুবই কম; কারণ খুড়িমা মোক্ষদা হচ্ছেন একটি গজগজে ও ঝগড়াটে স্ত্রীলোক। তার বয়স গেছে ষাট পেরিয়ে, আর তিনি মুখ করে থাকেন সর্বদা তেলো-হাড়ির মতন।

মোক্ষদা বাড়িতে বেশি লোকজনের আনাগোনা পছন্দ করতেন না। তার নিজের মনের মতন লোক ছিল কেবল দু-তিন জন বুড়ি এবং তারও কারণ তিনি যা বলতেন, তারা তাই বেদবাক্য বলে মেনে নিত! মোক্ষদা কারুর প্রতিবাদ সহ্য করতে পারতেন না। যখন কোনও অসভ্য ও বোকা লোক তার কথায় সায় দিতে রাজি হত না, তখন ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াত বিষম গোলমেলে।

হ্যাঁ, পমির বয়স পুরো ছয় বছর, এইবারে সাতে পড়বে সে —এটা বড়ো যে-সে কথা নয়। কিন্তু কথাটা যত বড়োই হোক, পমি যখন তার খুড়ির মুখের পানে তাকিয়ে দেখত, তখন এত বড়ো কথাটাও মনে হত যেন নিতান্তই ছোটা। এবং মনে মনে পমির দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই গোটা পৃথিবীর সমস্ত লোকই হচ্ছে তার খুড়িরই মতন।

মোক্ষদা কখনও কখনও সারাদিন ধরেই পমিকে এমন খাটান খাটাতেন যে, সে বেচারা এক মিনিটের জন্যেও হাঁপ ছাড়তে পারত না। অথচ পমি হচ্ছে নাকি তার প্রাণের নিধি। তাকে ভালোবাসতেন বলেই তিনি নাকি তার সমস্ত দোষ আবিষ্কার করতে চাইতেন—

অন্তত মোক্ষদার মনের মতন লোকেরা প্রায়ই এই কথা বলত। (যদুবাবুও এইরকম মত প্রকাশ করতেন। যদুবাবু ভদ্রলোক হলে কী হয়, তিনি ছিলেন পমির চোখের বালি।)

অতএব সবাই যখন বলে যে খুড়ি ভালোবাসতেন বলেই তাকে এত কষ্ট দেন, পমিও তখন কথাটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হল। কিন্তু এটা পছন্দ করবার মতন কথা নয়। আর একটা ব্যাপার সে পছন্দ করতে পারত না। তার আদরের মা গিয়েছেন স্বর্গে, অথচ মোক্ষদা সুযোগ পেলেই তার নামে যা তা কথা বলতে কসুর করতেন না।

লোকে বলে বটে তার খুড়ি তাকে ভালোবাসেন। কিন্তু পমির সন্দেহ হয় যে, তার ভালো-মন্দ নিয়ে খুড়ি কোনওদিনই মাথা ঘামাননি। তাদের দুজনেরই মতিগতি একেবারেই আলাদা। যখন তার মেজাজ খুশি থাকে তখনও সে ভয়ে প্রাণ খুলে হাসতে পারত না। তার হাসির শব্দ নাকি একটা গোলমেলে ব্যাপার, শুনলেই মোক্ষদার মাথা ধরে যায়! যখন তার মন চাইত দৌড়তে আর লাফাতে আর ঘাসের উপরে শুয়ে গড়াগড়ি দিতে, তখনও মনের ইচ্ছা তাকে মনেই দমন

করে ফেলতে হত, কারণ এসব করা নাকি অসভ্যতা অসভ্যতা সম্বন্ধে তার খুড়ির ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট ও নিশ্চিত।

বিন্দু ছিল সে বাড়ির পুরাতন দাসী। আজ কুড়ি বছরের অভ্যাসের পর সে হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন জ্যান্ত পাথরের দেওয়াল, মোক্ষদার সমস্ত বাক্যবাণই তার গায়ে লেগে ফিরে যায়, কোনও আঁচড়ই কাটতে পারে না!

ছোট্ট পমিকে নিয়ে বিন্দু বেশি মাথা ঘামাবার সময় পেত না। ভোর আর রাত ছাড়া পমির সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ হত খুবই কম, কারণ সারাদিনটাই তাকে ঘরের কাজকর্ম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত।

কাজেই পমির সামনে সর্বদাই হাজির থাকতেন খুড়ি মোক্ষদাই। তার কাছ থেকে সে কখনও একটি মিষ্টি কথা, বা একটুখানি আদর বা একটিমাত্র চুম্বন উপহার লাভ করেনি। তাই পমির মনে হত, এ দুনিয়ায় তার এমন একটি লোকের দরকার যাকে সে ভালোবাসতে পারে এবং যার কাছ থেকে সে ফিরে পেতে পারে ভালোবাসা।

তার মনের কথা বলবার একটিমাত্র লোক ছিল, সে হচ্ছে বিন্দু। একদিন সকালে বিন্দু বঁটির সামনে বটে কুটনো কুটছে, হঠাৎ সে বলে উঠল, কেউ আমাকে ভালোবাসে না। কুটনো কুটতে কুটতে বিন্দু মুখ তুলে বললে, 'তুমি ভালোবাসা চাও পমিবাবু? তাহলে যাও, বিয়ে করে একটি বউ নিয়ে এসো।'

পমি ঘাড় হেট করে বললে, আমি তো বউ আনতে পারব না!

—কেন?

—আমি যে ভারী ছোট্ট?

—বেশ তো, একটি ছোট্ট দেখেই বউ আনো না।

—ছোট্ট বউ! পমি ভাবলে, বিন্দুর বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছুই নেই।

—বিন্দু বললে, হ্যাঁ, ছোট্ট বউ।

—ছোট্ট বউ আবার কোথায় পাব?

—কোথায় আবার? রাস্তায়? পমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে একবার রান্নাঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে। তারপর বললে, কিন্তু একথা শুনলে খুড়িমা কী বলবেন?

বিন্দু খিলখিল করে হেসে একেবারে লুটিয়ে পড়ল।

পমি ভাবলে, নিশ্চয় সে খুব বোকার মতন কথা বলেছে।

বিন্দুও হচ্ছে মোক্ষদার মতন বিষম মোটা, কিন্তু তার মনটি ছিল স্নেহে-মায়ায় পরিপূর্ণ। পমিকে সে বড়ো ভালোবাসত। এই মা-হারা ছোটো ছেলেটিকে সে নিজের ছেলের মতোই আদর-যত্ন করত, বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেত এবং তার মনের দুঃখ ভোলাবার জন্যে চেষ্টারও ত্রুটি করত না। সে যে তাকে ভালোবাসে পমিও একথা বুঝত। কিন্তু সে হচ্ছে কত ছোটা, আর বিন্দু হচ্ছে তার চেয়ে কত বড়ো তারা দুজনে যেন দুই জগতের জীব। এইজন্যেই পমি খুঁজছে তারই সমবয়সি কোনও মনের দোসরকে।

সেদিন ঘুম ভাঙবার পর থেকেই মোক্ষদার মেজাজটা হয়েছিল বিষম ঝাঁঝালো। দুর্ভাগ্যক্রমে সেইদিনই খুড়ির সামনে দিয়ে একখানি নতুন রঙিন রুমাল নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে কোথায় যাচ্ছিল পমি।

যেই তাকে দেখা মোক্ষদা আমনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, কে তোকে ওটা দিলে?

পমি ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, কীসের কথা বলছ খুড়িমা?

—ওই যেটা তোর হাতে রয়েছে?

—এই রুমালের কথা বলছ?

—হ্যাঁ, রুমালের কথাই বলছি। তুই কি বুঝতে পারছিস না? আমি কি সংস্কৃত ভাষায় কথা বলছি?

পমি নতমুখে বললে, খুড়িমা, এ রুমালখানা তো তুমিই আমাকে দিয়েছ!

মোক্ষদা আরও জোরে চিৎকার করে বললেন, আমি? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? আমি তোকে কিছুই দিইনি। কোত্থেকে ওখানা চুরি করলি?

—খুড়িমা, আমি তো চুরি করিনি।

—যা, এখনই রুমালখানা রেখে আয়! তোর মতন নোংরা ছেলের হাতে সব সময়ে ও রকম রুমাল শোভা পায় না! আজ যদি রবিবার হত তাহলে কোনও কথা ছিল না বটে।

—খুড়িমা, আজ তো রবিবার।

—না, কখনোই নয়। গর্জন করে বললেন মোক্ষদা। হতভাগা, বাঁদর ছেলে, আজ রবিবার নয়! আমি যদি বলি, আজ রবিবার হলেও রবিবার হবে না? পমি মৃদুস্বরে বললে, 'খুড়িমা, আজ তাহলে শনিবার!

—না, আজ হচ্ছে সোমবার। আজ যদি সোমবার না হয়, তাহলে আজ মঙ্গলবার হতেও পারে। কিন্তু শনিবার? আজ শনিবার হওয়া অসম্ভব। শনিবার ছিল কাল।

কাল গিয়েছে শনিবার, আজ তবু রবিবার নয়! ছোট্ট হলেও পমি বুঝলে, এর উপরে আর কোনও কথা বলা চলে না। সে একেবারে চুপ মেরে গেল। কিন্তু সে কথা না বললেও মোক্ষদা ঠান্ডা হলেন না, তখন তার মাথায় চড়েছে রাগ।

ঠিক সেই সময়ে পাশের ঘর থেকে যদুবাবুর গলা পাওয়া গেল।

মোক্ষদা রাগে ফুলতে ফুলতে বললেন, ওই হাড়-জ্বলানো লোকটা আবার কী করতে এসেছে?

পমি বললে, খুড়িমা, উনি যে যদুবাবু!

—যদুবাবু তো হয়েছে কী! হাড়-জ্বলানো লোক!

পাশের ঘর থেকে যদুবাবু শুধোলেন, আমি কি ভেতরে যাব? আমি কি ভেতরে যাবার হুকুম পাব?

মোক্ষদা বললেন, ভেতরে আসুন।

যদুবাবু লোকটি যুবক নন, তার দাঁত বাঁধানো, গোঁফে ও মাথার চুলে তিনি কলপ দেন—যদিও তার মাথায় চুল আছে ঠিক গোনা দশগছি। তার জামাকাপড়ও ধোপদস্ত, ফিটফট। চোখে সোনার চশমা, হাতে সোনা বাঁধানো লাঠি। যদুবাবু দরজা একটুখানি খুলে ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি যেতে পারি? আমি কি ভেতরে যাবার হুকুম পাব?

মোক্ষদা উচ্চকণ্ঠে বললেন, কী আশ্চর্য। আসুন, ভেতরে আসুন কতবার এক কথা বলব?

যদুবাবু বাহির থেকেই বললেন, আমার ভয় হচ্ছে, আমি বোধহয় অসময়ে এসে পড়েছি। হয়তো আপনি বিরক্ত হবেন!

—হলুমই বা বিরক্ত আসুন।

যদুবাবু ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে দরজাটি আবার সযত্নে ভেজিয়ে দিলেন!

—তা আছে বইকি! আমি এইমাত্র শুনলুম, ঘোষেদের বাড়ি— এই পর্যন্ত বলেই পমিকে দেখতে পেয়ে যদুবাবু মুখ বন্ধ করলেন।

মোক্ষদা বললেন, ওই খুদে বাঁদরটাকে দেখে আপনি কথা বন্ধ করলেন কেন?

যদুবাবু বললেন, না, ওর এখানে থাকা উচিত নয়।

মোক্ষদা বললেন, পমি, এদিকে আয়।

পমি কাছে এসে বললে, কী খুড়িমা?

মোক্ষদা আঁচলের বাঁধন খুলে একটি সিকি বার করে বললেন, পমি, এখনই চার আনা দিয়ে এক কৌটো জর্দা কিনে নিয়ে আয়। আমি কী জর্দা খাই জানিস তো?

—জানি খুড়িমা! পাতি জর্দা।

—আচ্ছা, যা। দেখিস, সিকিটা হারিয়ে ফেলিস না যেন!

পমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে সরে পড়ল। পাছে মোক্ষদা আবার তাকে ডাকেন, সেই ভয়ে সে একবারও আর ফিরে তাকালে না। সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে নীচের দিকে নেমে গেল, তারপরেই গিয়ে পড়ল একেবারে রাস্তায়। তখন সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল—স্বাধীন, সে স্বাধীন!

পমি বনমালার নাম শুনলে

মোক্ষদা বলতেন, ভদ্রলোকের ছেলের উচিত নয় রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাওয়া। পমি তাই রাস্তায় না নেমে ফুটপাথ ধরে চলতে লাগল। মোক্ষদার উপদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করত—আহারে-বিহারে সর্বদাই তিনি তার ঘাড়ে চেপে থাকতেন ভূতের মতন। আড়ালে গিয়ে পমি সর্বদাই দেখতে পেত মোক্ষদা যেন তার মুখের পানে কটমট করে তাকিয়ে আছেন!

তাদের বাড়ি থেকে মনিহারির দোকান খুব কাছে ছিল না। গোটা রাস্তাটা আর একখানা সরকারি বাগান পেরিয়ে তবে সেখানে গিয়ে হাজির হওয়া যায়। রাস্তাটা লম্বা বলে পমি খুব খুশি হল। এই ফাঁকে খানিকটা ছুটি পাওয়া যাবে তো।

খুশি হয়ে পমি একবার শিস দিলে, কিন্তু তারপরেই থেমে গেল। মোক্ষদার উপদেশবাণী মনে পড়ল—শিস দেয় খালি ছোটোলোকের ছেলেরা।

শিস দেওয়া বন্ধ করে সে গান গাইতে শুরু করলে, কিন্তু তখনই তাকে গান থামাতে হল। কারণ মোক্ষদা বলেন—সভ্য ছেলেরা রাস্তায় কখনও গান গায় না।

রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে যেন রোদের সোনার জল এবং আকাশ নীলপদ্মের মতন নীল। মন্দিরের চুড়োর উপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে উড়ে যাচ্ছে চিলের পর চিল। এবং এখানে ওখানে চড়াই পাখিরা ধরেছে চটুল গান।

পমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ এইসব দেখতে লাগল। তারপর রাস্তা থেকে একখণ্ড কাঠ-কয়লা কুড়িয়ে নিয়ে পথের ধারের বাড়ির দেওয়ালগুলোর উপরে লম্বা একটা রেখা টানতে টানতে অগ্রসর হল। হঠাৎ আবার সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মনে হল, সে যে লিখতে পারে এটা সকলকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। তখন সে আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি

পরিষ্কার সাদা দেওয়ালের উপর বড়ো বড়ো হরপে লিখলে—‘পমি’। এক বার নয়, দুই বার নয়, অনেক বারই সে লিখলে নিজের নাম।

হঠাৎ তার গালের উপর পড়ল একটা বিষম চড় এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনলে, হতভাগা ছেলে, ইস্কুলে গিয়ে এই বুঝি তোমার বিদ্যে হয়েছে?

চমকে পিছন ফিরে পমি যে মূর্তিটাকে দেখলে, তার মনে হল বুঝি মনুমেন্টের মতন লম্বা! পর মুহূর্তে সে আর পিছন দিকে না তাকিয়ে হনহন করে সেখান থেকে সরে পড়ল।

কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই ভুলে গেল এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। আলো-মাখা আকাশ বড়োই সুন্দর, তার তলায় এমন স্বাধীনভাবে বেড়াবার সুযোগ পাওয়া বড়ই আনন্দকর। এখানে খুড়িমার ধমকও নেই, চোখরাঙানিও নেই।

মনিহারির দোকানে ঢুকে সে বললে, খুড়িমার জন্যে চার আনার পাতি জর্দা দিন।

কেউ জবাব দিলে না। দোকানের কোণে একটি বুড়ো ভদ্রলোক বসেছিলেন, দোকানদার এক মনে তার সঙ্গে কথা কইছিল। পমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগল।

ভদ্রলোক বললেন, বনমালা।

—মেয়েটি এখন কোথায়?

—নিশ্চয়ই পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে।

—কেউ কি তাকে আশ্রয় দেয় না?

—না।

—তার কি আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?

—আছে। কিন্তু তারা তার বোঝা ঘাড়ে চাপাতে চায় না।

—কী দুরাত্মা!

—তাকে কোনও অনাথ-আশ্রমে পাঠাতে হবে।

—কিন্তু কে পাঠাবে?

—কে আবার? আমাদেরই ও ভার নিতে হবে।

—এখন রাত হলে সে কোথায় ঘুমোয়?

—রাস্তার ধারের রোয়াকে।

দোকানদার মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, আমি তাকে আশ্রয় দিতে পারতুম, কিন্তু আমার যে ছাই বাড়তি ঘর নেই!

পমি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে একবার দোকনদারের, আর একবার সেই বুড়োর মুখের পানে তাকাতে লাগল।

এতক্ষণ পরে দোকানদার জিজ্ঞাসা করলে, "খোকাবাবু, তোমার কী চাই?

পমি বললে, খুড়িমার জন্যে চার আনার পাতি জর্দা দিন।

—চার আনার?

—হ্যা।

—তোমার খুড়িমা কে?

—তিনি আমার খুড়িমা।

—তিনি কী করেন?

—তিনি যদুবাবুর সঙ্গে কথা কইছেন।

—না, না, আমি ও কথা জিজ্ঞাসা করছি না! তিনি কী কাজ করেন?

—তিনি কোনও কাজ করেন না।

—তাহলে তোমার খুড়িমার অনেক টাকা আছে বুঝি?

—আমি জানি না।

দোকানদার আর সেই বুড়ো লোকটি একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল।

—তোমার নাম কী?

—আমার নাম পমি।

—তোমার বয়স কত?

—ছয়, কিন্তু এইবারে সাত বছরে পড়লুম বলে।

—তুমি পড়াশুনো করো তো?

—হ্যাঁ। আমি পাঠশালায় পড়তে যাই।

দোকানদার বললে, বেশ, বেশ! আমাকে চার আনা পয়সা দাও। এই নাও তোমার জর্দা।

পমি দাম দিয়ে ও জর্দা নিয়ে দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে ভাবতে লাগল

'এই বনমালা মেয়েটি কে? সে এখন কোথায় আছে?...বোধহয় তার ভারী খিদে পেয়েছে? তাহলে একথা সত্যি যে দুনিয়ায় এমন সব ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েও আছে যাদের কেউ নেই, না বাবা, না মা—এমনকি, না খুড়িমা।'

তাহলে এমন সব গরিব ছেলে-মেয়েও আছে যারা পরে থাকে ছেড়া ন্যাকড়া, শুয়ে থাকে পথের ধারে আর মাথার উপর দিয়ে তাদের বয়ে যায় শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা!

ফুটপাথের পাথরের দিকে তাকিয়ে সে পায়ে পায়ে এগুতে লাগল ধীরে ধীরে। তার সারা মনটি জুড়ে জাগতে লাগল কেবল সেই একটি নাম—বনমালা, বনমালা, বনমালা!

বনমালা? ও-নামের কোনও ছোট্ট মেয়েকে তো আমি চিনি না! আহা বেচারি, না জানি সে কতই অসুখী! হয়তো সে সারাদিনই ঝরঝর করে কাঁদে, কিন্তু কেউ তাকে কখনও একটি মিষ্টি কথাও বলে না—এমনকি তার খুড়িমাও নেই।

পমি অনুভব করলে তার বুকের ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে একটা দারুণ দুঃখের ভাব! পমি প্রতিজ্ঞা করলে, সে নিশ্চয় বনমালাকে সাহায্য করবে,

নিশ্চয় তাকে খুঁজে বার করবে! কিন্তু সে কোথায় আছে! কোথায় গেলে তার দেখা পাওয়া যাবে?

সে ভাবতে আর ভাবতে লাগল। সোনালি রোদ আর আকাশের নীলিমা আর পাখিদের গান আর তার চোখ-কানের ভিতরে ধরা দিলে না।

কিন্তু যখন সে নিজের বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল, হঠাৎ বনমালাকে খুঁজে বার করবার একটা উপায় সে আবিষ্কার করে ফেললে। তখন তার মন আনন্দের আবেগে এমন উচ্ছসিত হয়ে উঠল যে, সে একবারও শুনতে পেলে না মোক্ষদা চোখ রাঙিয়ে চিৎকার করে বলছেন, জর্দা কিনতে এত দেরি? ওরে, তুই কী বিষম হারামজাদা ছেলে রে, ওরে গতর-খেকো, পাজি, নচ্ছার! তোর মতন হতভাগাকে কেন যে বাড়ি থেকে বিদেয় করে দিইনি সেটা আমি নিজেই বুঝতে পারছি না!

পমি বেরুল বনমালার সন্ধানে

না, মোক্ষদার একটা কথাও সে শুনতে পায়নি। সে জর্দার কৌটোটা খুড়িমার হাতে গুজে দিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ে হাজির হল গিয়ে একেবারে রান্নাঘরে।

বিন্দু তখন এক মনে ইলিশ মাছের আঁশ ছাড়াচ্ছিল, পমিকে দেখতে পেলে না।

পমি খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বিন্দু তাকে দেখতে পেয়ে বললে, কী গো ফুলবাবুটি, কী মনে করে? খিদে-টিদে পেয়েছে বুঝি?

পমি ঘাড় নেড়ে বললে, না।

—তোমার খিদে পায়নি কেন?

পমি কচুমাচু মুখে বললে, আমার দুঃখু হয়েছে।

—দুঃখু! কেন?

—একটি গরিব মেয়ে উপোস করে আছে।

—একটি গরিব মেয়ে?

—হ্যাঁ

—কে সে?'

—তার নাম বনমালা?

—তুমি তাকে চেনো?

—না।

—তবে তুমি কেমন করে জানলে সে উপোস করে আছে?

—কেউ আমাকে বলেছে!

—শোনো একবার ছেলের কথা! পমির দুঃখ বিন্দু আর গ্রাহের মধ্যেই আনলে না, হেট মুখে ইলিশ মাছটা দুই হাতে বঁটির উপরে তুলে ধরে তার মুণ্ডচ্ছেদ করে ফেললে।

পমি সাহস সঞ্চয় করে আবার বললে, আচ্ছা, আমি তাকে খুঁজতে বেরুই।

—কাকে?

—বনমালাকে ।

—কোথায় তাকে খুঁজতে যাবে? স্বর্গে?

—না, রাস্তায়।

—যদি তাকে খুঁজে পাও, তাহলে তুমি কী করবে?

—তাকে আমাদের বাড়িতে আনব।

—তারপর বোধহয় তাকে উপহার দেবে তোমার খুড়িমার হাতে?

—হ্যাঁ।

—খাসা বুদ্ধি! বিন্দু হি হি করে হেসে এমন বেসামাল হয়ে পড়ল যে, তার হাত থেকে মুণ্ডহীন ইলিশ মাছটা খসে পড়ে গেল।

বিন্দুর ব্যবহারে পমি একটু থতমত খেয়ে গেল, বুঝতে পারলে না তার এত হাসির ঘটা কেন? কিন্তু সে এখন বনমালাকে খুঁজে বার করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাই কিছুমাত্র দমে না গিয়ে বললে, এখন চললুম।

বিন্দু বললে আচ্ছা।

—খুড়িমা যদি আমাকে খোঁজেন তাহলে তাকে বলো যে, তুমি আমাকে বাইরে পাঠিয়েছ।

—আচ্ছা।

—আসি তাহলে।

—এসো।

পমি জামার দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে শান্ত গম্ভরিভাবে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল!

পথ ধরে খানিক এগিয়ে আবার সেই বাগান। তারপর এ-রাস্তা ও-রাস্তা, এ-গলি ওগলি, কিন্তু বৃথা! কোথায় বনমালা?

মাঝে মাঝে ভাবে, পথের লোকজনদের ডেকে জিজ্ঞাসা করে, মশাই, আপনি কি বনমালাকে দেখেছেন? কিন্তু তার ভরসা হয় না।

একটা বস্তির ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, একখানা চালাঘরের সামনে একটি ছোট্ট মেয়ে মাটির উপরে চুপ করে বসে আছে। পমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, তোমার নাম কী?

ছোট্ট মেয়েটা মুখ তুলে খাপ্পা হয়ে বললে আমার নামে তোর কী দরকার?

—তোমার নাম কি বনমালা?

—বাঁদরমুখো ছেলে, চলে যা এখান থেকে!

পমি সুড়সুড় করে আবার এগিয়ে চলল। একটু এগিয়ে দেখলে, পথের ধারের একটা জলের কলের সামনে তিনটি ছেলে খেলা করছে। সে তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনতে শুনতে ভাবতে লাগল, তারা যা বলছে, খুড়িমা একবার যদি শুনতে পান তাহলে কী ভয়ানক ব্যাপারই হবে!

তারপর সে আস্তে আস্তে যেই অগ্রসর হল অমনি একটি ছেলে তাকে ডেকে বললে, ওহে খুদ-কুড়োবাবু, নতুন দেশ দেখতে চাও?

পমি দাঁড়িয়ে পড়ল। তারা যে তাকেই ডাকছে সেটা সে বুঝতে পারলে না, কারণ তার নাম খুদ-কুড়োবাবু নয়। খানিকক্ষণ বিস্ফারিত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে সে আবার এগুবার উপক্রম করলে।

কিন্তু ছেলেটি আবার বললে, ওহে, তুমি কি একবার উকি মেরে নতুন দেশ দেখবে?

—সে আবার কী?

—বলি, দেখতে চাও? বলো হ্যাঁ, কি না।

—আমি কী দেখব?

—“তুমি দেখবে দিল্লি আর মক্কা, যমরাজার দরবার, ইন্দ্রপুরীর ম্যাপ, দ্যাখনহাসি ডাইনি বুড়ি, মৎস্যরানির নাচ আর ক্রিস্টোফার কলম্বাসের ফটো!

পমি আগেও বুঝতে পারেনি, এখনও কিছু বুঝতে পারলে না।

ছেলে তিনটে হেসে গড়িয়ে পড়ল। সবচেয়ে বড়ো ছেলেটা বললে, এদিকে এসো। ব্যাপার কী? তুমি কি ভয় পেয়েছ?

—না, ভয় পাইনি।

—তবে তুমি কাছে আসছ না কেন?

—এই তো আমি এসেছি।

ছেলে তিনটে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। একজন বললে, তাহলে তুমি নতুন দেশ দেখতে চাও?

পমি খানিকক্ষণ চুপ মেরে দাঁড়িয়ে থেকে কী ভাবলে, তারপর বললে, আমায় কী দিতে হবে?

—একটা বোতাম।

—আমার কাছে তো বোতাম নেই!

—তার মানে?

—আমার পকেটে বোতাম নেই।

—তোমার, সার্ট আর কোটের উপর ওগুলো কী রয়েছে?

—তুমি কি এই বোতামই নেবে?

—হ্যা, নেবই তো!

—তারপর আমায় কী করতে হবে?

—কিছুই করতে হবে না। কেবল চোখ চেয়ে নতুন দেশ দেখবে আর কী?

পমি আর কিছু না বলে নিজের জামার উপর থেকে একটা বোতাম ছিড়ে নিয়ে সবচেয়ে বড়ো ছেলেটার হাতে সমর্পণ করলে।

ছেলে তিনটে হাতের আর চোখের ইশারায় নিজেদের ভিতর কী একটা পরামর্শ করে নিলে। তারপর বড়ো ছেলেটা বললে, পাইপটা কোথায় গেল?

—এই যে, বলে আর একটা ছেলে একটা টিনের মোটা হাত তিনেক লম্বা নল নিয়ে তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে এল।

বড়ো ছেলেটা বললে, এই যন্ত্রটা আমরা আবিষ্কার করেছি কিন্তু কী করে এই যন্ত্রটা চালাতে হয়, তা আমরা কারুকে দেখাই না। ওহে খুদ-কুড়োবাবু, এই নলটা থাকবে তোমার ঠিক নাক আর মুখের উপর। তোমাকে আপাতত চোখ বুজে থাকতে হবে। তারপর আমি ডাকলেই তুমি আবার চোখ খুলবে আর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবে নতুন দেশ। বুঝেছ?

পমি ঘাড় নেড়ে বললে, হুঁ। তুমি যা যা বলেছ, সব দেখতে পাব তো?

—আলবত! তার চেয়ে আরও অনেক বেশি কিছু দেখবে। তুমি কখনও সমুদ্র দেখেছ?

—না।

—আচ্ছা, তোমাকে আমরা তাও দেখাব। এখন ফিরে দাঁড়াও, চোখ বন্ধ করো।

—চোখ বন্ধ করেছি।

—কথা কোয়ো না।

—আমি তো কথা কইনি।

—নিশ্বাস ফেলো না।’

দুই চোখ মুদে, শ্বাস বন্ধ করে পমি বোবার মতন দাঁড়িয়ে রইল। সেই অবস্থায় আশেপাশে শুনতে পেলে ফিসফিস করে কথা আর চাপা হাসির শব্দ। আর শুনতে পেলে, কাছেই কোথায় ডাকছে চার-পাঁচটা চড়াই পাখি কিচির-মিচির করে। খানিক দূরে কোথায় যেন একটা দরজা বা জানালা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল।

তার কানের কাছে কে বললে, এইবারে নতুন দেশের খেলা শুরু হবে। তারপরেই সে শুনতে পেলে যেন একটা ঘড়ার ভিতর থেকে ভকভক করে জল বেরিয়ে আসছে।

আবার কে বললে, দ্যাখো, দ্যাখো, নলের ভেতরে এসেছেন যমরাজা নিজে। এমন কাণ্ড যে হতে পারে, পমি কখনও তা ধারণায় আনতে পারেনি। তার সারা গায়ে কাঁটা দিলে। হঠাৎ নলের একটা মুখ কে তার মুখের উপরে চেপে ধরে বললে, এই দ্যাখো নতুন দেশ! চেয়ে দ্যাখো।

কিন্তু পমি চোখ খোলবার আগেই তার নাক-মুখের ভিতরে হুড় হুড় করে জলের ধারা এসে পড়ল বিষম তোড়ে। তার নাক মুখ চোখ সমস্ত জলে জলে ভরে উঠল এবং জামাকাপড় পর্যন্ত একেবারে ভিজে গেল।

তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে দুই হাতে চোখ মুছে সে চারিদিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে দেখলে, কিন্তু তিনটে ছেলের একটাও সেখানে নেই।

খানিকক্ষণ সে কাঁদো কাঁদো মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝল ছেলেগুলো তাকে নিষ্ঠুরভাবে ঠকিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। তারপর আবার গুটি গুটি এগুতে লাগল। তার জামার একটা বোতাম কমে গেল বটে, কিন্তু তার বুদ্ধি আর একটু বাড়ল।

পমি জামা-কাপড় হারালে

পমি নিজের মনেই এগিয়ে চলেছে! আর তার চোখ দিয়ে তখনও ঝরছে ফোটা ফোটা জল।

হঠাৎ শুনলে কে বলছে, তুমি কাদছ কেন খোকাবাবু?

পমি ফিরে দেখলে, একখানা বাড়ির দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বারো-তেরো বছরের একটি সুন্দর মেয়ে। পমি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ভালো করে তার দিকে তাকিয়ে দেখলে।

তোমার কী হয়েছে খোকাবাবু? তুমি কি পথ হারিয়েছ?

—না।

—তুমি কোথায় থাকো?

পমি নিজের ঠিকানা বললে।

—তুমি একলা পথে বেরিয়েছ কেন?

—আমি বনমালাকে খুঁজছি।

—বনমালা কে? তোমার বোন?

—না। একটি ছোট্ট মেয়ে। সে যে কে তা আমি জানি না।

—তুমি একটি ছোট্ট মেয়েকে খুঁজছ, কিন্তু তাকে চেনো না?

—না।

—তবে তুমি তাকে কেমন করে খুঁজে বার করবে?

—আমি জানি না।

—খোকাবাবু, তুমি তো ভারী মজার ছেলে দেখছি! তা তুমি বনমালাকে খুঁজছ কেন?

—তার যে মা নেই, বাবা নেই, আর সে যে উপোস করে থাকে।

—তোমার বাবা-মা কেমন করে তোমাকে একলা পথে ছেড়ে দিলেন?

—আমি বিন্দুকে বলে এসেছি।

—বিন্দু কে?

—আমাদের ঝি।

—কিন্তু তোমার মা শুনলে কী বলবেন?

—আমার মা নেই! আমার খালি খুড়িমা আছেন!

—আহা!

—আমার নাম পমি।

—আহা, বেচারা পমিবাবু! মেয়েটি মমতা-ভরা চোখে পমির দিকে তাকিয়ে রইল। পমি বললে, আজ তবে আসি?

—তুমি কোথায় যাবে?

—কোথায় যাব, জানি না!

—সন্ধের আগে বাড়ি ফিরে যেয়ো। তোমার জামা-কাপড় ভিজে কেন? তুমি কী করছিলে?

—নতুন দেশ দেখছিলুম। বলেই পমি আবার কেঁদে ফেললে। তার কথা কিছুই বুঝতে না পেরে মেয়েটি হেসে ফেললে। পমি আর সেখানে দাঁড়াল না।

পমি আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল। হাওয়ায় আর রোদের তাতে তার জামা কাপড় আবার শুকিয়ে এল এবং খানিকক্ষণ পরে সে-ও ভুলে গেল তার নতুন দেশ দেখার দুঃস্বপ্ন।

সাত-আট বছরের তিনটি মেয়ে বোধহয় ইস্কুল থেকে ফিরে আসছে! তাদের এক হাতে বইয়ের গোছা, আর এক হাতে লজেঞ্জসের লাঠি। তারা আসছে হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে আর গাইতে গাইতে—ঠিক যেন তিনটি চলন্ত আনন্দের ফোয়ারা। তারা যে বড়োলোকের মেয়ে নয়, এটা তাদের জামা-কাপড় আর জুতো দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু সেজন্যে তাদের দুঃখ নেই কারণ তারা গলা ছেড়ে গান গাইছিল—

চু রে রাং চাং! সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে ঠ্যাং,
কাঁপিয়ে মাটি পুকুর পাড়ের, ধরব খালি কোলা-ব্যাং!
দেখব কে আর তাদের বাঁচায়,
রাখব পুরে লোহার খাঁচায়,
সন্ধে হলে কণ্ঠ ছেড়ে গাইবে তারা গ্যাঙর-গ্যাং?

পমি দাঁড়িয়ে পড়ে গান শুনতে লাগল। মেয়ে তিনটি গাইতে গাইতে আরও কাছে এগিয়ে এল—

উনুন, কড়া দরকার ভারী,
রাঁধব ব্যাঙের কোর্মা-কারি,—
খবর পেয়ে আসবে যখন চিন-মুলুকের চুচুং-চ্যাং!

গান ফুরুতেই তারা সকৌতুকে এত জোরে হেসে উঠল যে, শুনলে পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী, হতভাগ্যের মুখেও ফুটে উঠবে অট্টহাসির হইহই। এমনকি, পমিও না হেসে পারলে না। এবং সে-ও এইমাত্র শোনা গানের দুটো লাইন আবৃত্তি করে গেল—

চু রে রাং চাং! সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে ঠ্যাং,
কাঁপিয়ে মাটি পুকুর পাড়ের, ধরব খালি কোলা ব্যাং!

তার উচিত ছিল গানের লাইন দুটি উচ্চারণ না করা। কারণ তার মুখে সেই গান শুনেই মেয়ে তিনটি থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল, এবং তার দিকে তাকিয়ে রইল ঘৃণাভরা চোখে।

একটি মেয়ে বললে, আমাদের গান গাইছিস, তুই কে রে ছোড়া? আমরা তোকে চিনি না! যা, নিজেদের দলে গিয়ে ভিড়গে যা।

পমি অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করলে। নিজের জন্য নয়, সে লজ্জা পেলে ওইটুকু মেয়ের মুখে অমনধারা কথা শুনে। জিজ্ঞাসা করলে, আমি কী দোষ করেছি?

—যা, যা! নিজের চরকায় তেল দিগে যা, আমাদের আর জ্বালাতে হবে না!

মেয়ে তিনটি রেগে কটমট করে তার পানে তাকালে। একটি মেয়ে বললে, ভারী যে কথা শিখেছিস দেখছি! অত কথা কে তোকে শেখালে?

এইবারে পমির মনে একটু একটু করে রাগ বাড়তে লাগল। সে বললে, তোমরা কার কাছ থেকে কথা কইতে শিখেছ?

—যে সব ছোড়াকে চিনি না, তাদের সঙ্গে আমি কথা কই না।

পমি উপদেশ দিলে, বেশ, তাদের সঙ্গে কথা কোয়ো না।

—আমার যা খুশি তাই করব, তুই হচ্ছিস পাজির পা-ঝাড়া ছেলে!

—আর তুমি হচ্ছ একটি মস্ত বোকা মেয়ে!

—আর তুই হচ্ছিস একটা ল্যাজ-কাটা গাধা! প

মি মুখ রাঙা করে বললে, ভালো চাও তো এখান থেকে সরে পড়ে। আমি মেয়েদের সঙ্গে লড়াই করতে চাই না।

একটি মেয়ে বললে, আ হা হা, দুধের খোকা, উনি মেয়েদের সঙ্গে লড়বেন না! আর একটি মেয়ে বললে, সরে পড়ো খোকা, চটপট সরে পড়ো!

পমি মাথা নেড়ে দৃঢ়স্বরে বললে, না, আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকব।

মেয়ে তিনটি তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে পমির উপরে বাঘের বাচ্চার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। পমিও হটবার পাত্র নয়, সে-ও প্রাণপণে ঘুসি বাগিয়ে যুঝতে

লাগল। হঠাৎ এই হইচই দেখে একটা পেয়ারা গাছের উপরে তিন-চারটে কাক কা' কা' রবে চিৎকার জুড়ে দিলে।

পমির অবস্থা যখন রীতিমতো কাহিল হয়ে এসেছে, সেই সময়ে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হল একটি বৃদ্ধা নারী। তার ধমক খেয়েই দুর্দান্ত মেয়ে তিনটে পাই পাই করে পালিয়ে গেল। এবং তার কাছ থেকে আর এক ধমক খেয়ে পমিও তাড়াতাড়ি নিজের পথ ধরলে।

পমির তখন অতিশয় দুরবস্থা। তার মুখে গলায় ও হাতে লম্বা লম্বা আঁচড়ের রক্তাক্ত দাগ এবং তার নাক দিয়েও পড়ছে রক্ত। কিন্তু এসব সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না, যে কাজে বেরিয়েছে সে কাজ আগে শেষ করা চাই। হাজার বিপদ এলেও সে আর পিছপাও হতে রাজি নয়। দু-একটা রাস্তা পেরিয়েই সে আবার ভুলে গেল সমস্ত দুর্ঘটনার স্মৃতি।

আর কিছুক্ষণ পরেই পৃথিবীর বুকের উপরে ঘনিয়ে আসবে সন্ধ্যার ছায়া। কিন্তু তবু বাড়ি ফেরবার কথা তার মনে হল না।

বনমালা বনমালাকে না নিয়ে সে আর ঘরে ফিরবে না। যদি সন্ধ্যা নামে, রাত হয়, রাত পুইয়ে যায়, তবু বনমালাকে না পেলে সে বাড়ির কথা ভাববে না।

পমি অনেক রূপকথা শুনেছে। সে জানে রাজার ছেলে চোখে না দেখেই অজানা রাজকুমারীর সন্ধানে ঘোড়ায় চড়ে পথে বেরিয়ে পড়ে, কত পথ, কত তেপান্তর, কত গহন বন আর নদী পাহাড় পেরিয়ে চলে রাজার ছেলে, এগিয়ে চলে। তারপর ঘুমন্ত রাজকন্যাকে খুঁজে পায় কোনও রক্ষোপুরীর অন্তঃপুরে।

পমির মনে হল, রাজার ছেলে যদি অজানা রাজকুমারীর খোঁজে দিনের পর মাস, মাসের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারে, তবে অভাগিনী বনমালার জন্যে সে কী আর একটা রাতও বাইরে কাটাতে পারবে না?

পমি চলেছে তো চলেছেই। মাঝে মাঝে দু-একটি ছোটো মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু তাদের কারুর নাম বনমালা কি না, একথা জিজ্ঞাসা করবার

সাহস আর তার হয় না। তাদের কেউ বনমালা কি না জানবার জন্যে সে বুদ্ধি খাটিয়ে আর এক উপায় অবলম্বন করলে। নতুন কোনও মেয়ে দেখলেই খানিকক্ষণ তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে, তারপর তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে যেন কোনও অদৃশ্য মেয়ের উদ্দেশ্যেই সে চেঁচিয়ে ডাকে—বনমালা! ও বনমালা!

কিন্তু এই নতুন উপায়ও কাজে লাগল না। কারণ কোনও মেয়েই স্বীকার করলে না যে, তার নাম বনমালা। বার দশেক এই নতুন উপায়টি অবলম্বন করে শেষটা সে হতাশ হয়ে পড়ল।

এখন সে শহরের বাইরে এসে পড়েছে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখলে, ছোট্ট একটি আঁকাবাঁকা নদী বয়ে যাচ্ছে কুল কুল গান গাইতে গাইতে। দুই পাশে তার সবজে ঘাসের সতরঞ্চ পাতা, মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়, আর মাঝে মাঝে মস্ত মস্ত সবুজ ছাতার মতন বড়ো বড়ো গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে, পায়ের তলায় মিষ্টি ছায়া ফেলে। নীল আকাশের ভাঙা ভাঙা মেঘে আগুন জ্বলিয়ে সূর্য তখন পাটে বসছে।

জায়গাটি পমির ভারী ভালো লাগল। অন্তত পাঁচ ঘণ্টা ধরে সে টাে টাে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে। তার উপরে সারাদিন খাওয়া-দাওয়া হয়নি, তার শরীর ক্রমে এলিয়ে আসছে, পা আর চলতে চাইছে না! নদীর ধারে গাছের তলায় নরম ঘাসের উপরে বসে সে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করবে বলে মনে করলে। বসবার পর তার মনে হল একটুখানি শুয়ে নিলেও মন্দ হয় না। শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে সে দেখতে লাগল, গাছের সবুজ পাতার ফাঁকগুলো দিয়ে দেখা যাচ্ছে আলো-মাখানো টুকরো টুকরো নীল আকাশ। তার কানের কাছে বাজছে কোনও এক গানের পাখির বেলা শেষের সুর।..আর শোনা যাচ্ছে, পাতাদের সঙ্গে বাতাসের কানাকানি আর নদীর একটানা ছলাৎ ছলাৎ ছন্দ। নিজের অজান্তে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন ঘুম ভাঙল পমি চোখ চেয়ে দেখলে খালি অন্ধকার। সে চমকে তাড়াতাড়ি উঠে বসল, কিন্তু তখনও অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলে না, যদিও অনুভব করলে আর একটা ব্যাপার। সভয়ে সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে সে বুঝতে পারলে, তার পায়ে জুতো নেই, পরনে কাপড় নেই, গায়ে সার্টের উপরে কোটটাও নেই! আঁধারে চারিদিক হাতড়েও সে হারানো জিনিসগুলো খুঁজে পেলে না। যখন ঘুমোচ্ছিল তখন নিশ্চয়ই কোনও চোর এসে তার সব জিনিস চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।

রাত হয়েছে। কিন্তু কত রাত? তাও আন্দাজ করা গেল না। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল, কেন সে বোকার মতন ঘুমিয়ে পড়েছিল? ভয়ে পমি বনমালার কথাও একেবারে ভুলে গেল, নিজের কী হবে তাই ভেবেই অস্থির হয়ে উঠল। এই রাতে, এই নদীর ধারে, এই গাছের তলায়, এই অন্ধকারে সে তো সকাল পর্যন্ত বসে থাকতেও পারবে না, আর এমন ল্যাংটো হয়ে তার পক্ষে এখন লোকালয়ে মুখ দেখানেও অসম্ভব। পমি দেখেছে, ল্যাংটা হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় খালি পাগলরা। লোকে কি তাকেও শেষটা পাগল বলেই মনে করবে?

তা করে করুক। এখানে সকাল পর্যন্ত বসে থাকার কথা মনে হতেই তার বুকটা দুদুড় করে উঠল। না, যেমন করে হোক, এখান থেকে বেরিয়ে পড়তেই হবে! যত রাত বাড়ছে তত শীত বাড়ছে! পমি ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল—যেন তার হাড়ের ভিতর পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে ঠান্ডা কনকনে হাওয়া! সে মনে মনে বললে, বাইরে বেরুলে যদি কেউ আমাকে ল্যাংটো দেখে অবাক হয় তাহলে আমি বলব—মশাই, আমি পাগল নই। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন, কারণ চোরে আমার এই অবস্থা করেছে, আমি নিরুপায়।

সে আস্তে আস্তে কয়েক পদ অগ্রসর হল। কিন্তু কোন দিকে যাবে? অন্ধকারে পথ যে দেখা যায় না! তার বাড়ি ফেরবার পথ কোথায়? পমির মনে হল, এই তারার চুমকি বসানো কালো আকাশের তলায় সে যেন একটি ছোট্ট

ঝিঁঝিঁ-পোকা! তফাত খালি এই, ঝোপে-ঝাপে ঝিঁঝিঁপোকাদেরও বাসা থাকে, তার কিছুই নেই!

তার নরম খালি পায়ে পট পট করে কাঁকর ও কাঁটা বিঁধতে লাগল, কিন্তু তাও সে খেয়ালে আনলে না।

আচম্বিতে সে সভয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারেরও চেয়ে কালো মস্ত-একটা চলন্ত ছায়া! কী ওটা? গোরু, না মোষ, না বাঘ, না ভালুক? এই শীতেও সে ঘেমে উঠল। জানোয়ারটা কি তাকে দেখতে পেয়েছে! এখনই হালুম করে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে?

সে জুল জুল করে চারিদিকে তাকাতে লাগল। আকাশে কালো, পৃথিবীতে কালো, নদীর বুকেও কালো—সমস্তই অদৃশ্য হয়ে গেছে কালিমার জঠরে। তার উপরে কালিমারও চেয়ে কালো এই চলন্ত ছায়াটা! বাঁচবার আর কোনও উপায় নেই।

পমির কণ্ঠের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা করুণ কান্না। এই বয়সেই সুমুখে দেখলে সে মৃত্যুকে।

পমি একজনের দেখা পেলে

কিন্তু চলন্ত ছায়াটা পমির দিকে না এসে অন্যদিকে চলে গেল।

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে আবার অগ্রসর হল। দূর থেকে ভেসে এল একখানা রেলগাড়ির শব্দ। তাই শুনে বাড়ল তার সাহস। একটা আলো দেখা গেল—সরকারি ল্যাম্পের আলো। তাহলে নিশ্চয় ওখানে পথ আছে! পমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখলে যে, তার অনুমান সত্য। পথের ধারে জ্বলছে সেই আলোটা। এতক্ষণ সে ছিল অন্ধ, এইবারে দৃষ্টি ফিরিয়ে পেয়ে তার মন হল কতকটা শান্ত।

কিন্তু পথটা চিনতে পারলে না। এ পথ যদি তার বাড়ির দিকে না গিয়ে থাকে? এ পথ যদি তাকে নিয়ে যায় আরও অজানা, আরও ভয়াবহ কোন দেশে?

এ আবার নতুন দুর্ভাবনা! শীতে কাঁপতে কাঁপতে অত্যন্ত দুঃখিতভাবে পমি দাঁড়িয়ে রইল নাচারের মতো। আবার সে কেঁদে ফেললে।

হঠাৎ অত্যন্ত মিষ্টি ও মিহি-গলায় কে জিজ্ঞাসা করলে, কী হয়েছে খোকন?

জবাব না দিয়ে পমি কাঁদতে লাগল।

—খোকন, এই শীতে ল্যাংটো হয়ে তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন?

পমির কান্না থামে না, আরও বাড়ে।

—কেউ কি তোমাকে মেরেছে?

—না।

—তোমার কি শীত করছে?

—হ্যাঁ

—বড্ড শীত করছে, না?

—হ্যাঁ, বড্ড!

—তোমার জামাকাপড় কোথায় গেল?

—চোরে চুরি করেছে।

—কেমন করে?

—আমি নদীর ধারে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সেই সময়ে জামাকাপড় চুরি গিয়েছে।

—চোরেরা কী নির্দয়! তোমার ঠিকানা কী?

পমি নিজের ঠিকানা বললে।

—চলো, তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। দাঁড়াও, আগে আমার এই র‍্যাপারখানি গায়ে জড়িয়ে নাও। এই র‍্যাপারখানি ছাড়া আমার আর কোনও সম্বল নেই।

নিজেকে ল্যাংটো জেনে পমি এতক্ষণ লজ্জায় তার দিকে তাকায়নি। এখন সে দেখলে, তার গায়ে নিজের র‍্যাপার খুলে জড়িয়ে দিচ্ছে একটি মেয়ে। পমির চেয়ে মেয়েটি একটু বড়ো। তার গায়ে একটি ছেড়া ও মলিন জামা। তার মুখ ও দেহ ক্ষীণ। কিন্তু তার ডাগর চোখ দুটি দয়া-মায়া-মমতায় ভরা। মেয়েটির এলানো চুলগুলি তার বুক-কাঁধ-মুখের উপরে এসে পড়েছে।

তারা আস্তে আস্তে এগুতে লাগল। ক্রমে তারা শহরের ভিতরে প্রবেশ করলে।

পমির মন এখন নিশ্চিন্ত। সে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—তোমার বাড়িতে।

—তারপর তুমি কোথায় যাবে?

—মেয়েটি জবাব দিলে না।

—তুমি কোথায় থাকো?

—সব জায়গায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি বললে।

পমি এ কথার মানে বুঝতে পারলে না। মেয়েটির মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সব জায়গায় কি কারুর বাড়ি থাকতে পারে?

মেয়েটি হেসে বললে, আমার বাড়ি হচ্ছে এই পৃথিবী।

এ কথারও মানে হয় না। কিন্তু পাছে মেয়েটি তাকে বকে সেই ভয়ে সে আর মানে জিজ্ঞাসা করলে না। সে বললে, তুমি কি সেখানে একলা থাকো?

—না। আমার অনেক সাথি আছে।

—কে তারা??

—যেসব ছেলেমেয়ে আমার মতন একলা

পমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, দুনিয়ায় তুমি একলা?

—হ্যাঁ ভাই।

—তোমার কেউ নেই-একেবারে কেউ নেই?

—না, আমার কেউ নেই।

পমি গম্ভীর মুখে ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ শুধোলে, তাহলে তুমি কী করো?

—কী করি মানে?

—তুমি কেমন করে খাবার পাও?

—আমি ভিক্ষে করি।

—অ্যাঁ! পমি পয়সা বার করবার জন্যে পকেটে হাত দিতে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার হুস হল যে, সে এখন উলঙ্গ। বললে, আহা, বেচারি! এবং সঙ্গে সঙ্গে তার স্মরণ হল যে, কার খোঁজে আজ বেরিয়েছে সে। বললে, আচ্ছা, তুমি তাহলে নিশ্চয়ই বনমালাকে চেনো?

আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি বললে, বোধহয় চিনি।

—সে কোথায় থাকে? আমি আজ সারাদিন তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

—কেন?

—আমি তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই। বিন্দু সব জানে।

—তোমার বাড়িতে? কেন?

—আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকব।

মেয়েটি পমির হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চাপ দিলে, কিন্তু মুখে কিছু বললে না। তারা আবার চলতে লাগল, এবার আরও তাড়াতাড়ি।

পমি বললে, আজ আমি সারাদিন কিছু খাইনি।

—সে কী! কেন?

—কেন জানো? আমি যে বনমালার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু তবু তার দেখা পেলুম না!

মেয়েটি অতি মৃদুস্বরে বললে, না ভাই, তুমি তাকে দেখতে পেয়েছ।

—দেখতে পেয়েছি? কোথায়?

—নদীর ধারে।

—কই, আমি দেখিনি তো!

—হ্যাঁ দেখেছ। তুমি তাকে দেখেছ, তুমি তার সঙ্গে কথা কয়েছ।

—না আমি দেখিনি।

—হ্যাঁ তুমি দেখেছ! তুমি তাকে দেখেছ, তুমি তার সঙ্গে কথা কয়েছ আর বনমালাও তোমাকে ভারী ভালোবাসে।

পমি একটা পা এগিয়ে ফেলতে গিয়ে বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, সে আমাকে ভালোবাসে?

—হ্যাঁ। সে তোমাকে ভালোবাসে, তুমি যে বড়ো ভালো ছেলে!

—কে তোমাকে বললে সে আমাকে ভালোবাসে?

—সে নিজে বলেছে।

তারপর মেয়েটি হেট হয়ে দুই হাতে পমিকে ধরে অতি কষ্টে মাটি থেকে উপরে তুললে; এবং পমির মুখের সামনে নিজের মুখ এবং তার চোখের সামনে নিজের চোখ রেখে বললে, তুমি কী বুঝতে পারছ না, আমারই নাম বনমালা?

—তুমি? বলেই পমি ভাবলে, সে বোধহয় স্বপ্ন দেখছে!

কিন্তু তারপর যখন দেখলে যে, অভাগিনী বনমালার ডাগর দুটি চোখ ভরে উঠেছে অশ্রুজলে, তখন সে নিজের মুখ বাড়িয়ে তার মুখে দিলে চুমু। বনমালা তাকে আবার নামিয়ে দিলে। তারপর তারা আবার পথ চলতে লাগল, কিন্তু কারুর মুখে কোনও কথা নেই। তাদের গতি ক্রমেই দ্রুত হয়ে উঠতে লাগল এবং অবশেষে তারা একটি অন্ধকার রাস্তার ভিতর এসে ঢুকল; তারপর তারা একখানি নিস্তব্ধ বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বনমালা জিজ্ঞাসা করলে, এই কি তোমাদের বাড়ি?

পমি বললে, হ্যাঁ।

বনমালা দরজার কড়া ধরে নাড়া দিলে।

মোক্ষদার হাত থেকে পমিকে বাঁচাবার জন্যে বিন্দুর প্রচেষ্টা

মৌন-রাত্রির মাঝখানে কড়ার শব্দ যেই বেজে উঠল, অমনি বাড়ির ভিতর থেকে জেগে উঠল একটা অত্যন্ত কর্কশ চিৎকার–সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট পমির দেহ হয়ে গেল যেন আরও ছোট্ট।

সে ফিসফিস করে বললে, আমার খুড়িমার গলা!

বনমালা জিজ্ঞাসা করলে, তোমার খুড়িমার কী হয়েছে?

—তার মেজাজ ভালো নেই।

—তুমি এত রাতে বাড়ি ফিরছ বলে বুঝি?

—না, তিনি সব সময়েই ওই রকম। বলেই পমি যেখানটায় অন্ধকার সবচেয়ে বেশি ঘন সেইখানে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

বাড়ির ভিতর থেকে দরজা খুলেই বিন্দু জিজ্ঞাসা করলে, কে ডাকে।

পমি গলা নামিয়ে বললে, আমি পমি।

—পমি?

—হ্যাঁ।

—ওমা, অবাক! বিন্দু বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। হাতের লণ্ঠনটা উপরে তুলে পমিকে দেখতে পেয়ে বললে, হুঁ, এতক্ষণ কোথায় থাকা হয়েছিল?'

—আমি বনমালাকে খুঁজছিলুম।

—ও! বেশ, এখন তোমার খুড়ির কাছে জবাবদিহি করবে এসো। মজাটা আজ টের পাবে!

—কিন্তু আমি কী দোষ করেছি?

—তুমি কী দোষ করেছ? সেই কোন সকালে বেরিয়েছ, আর ফিরে এলে এই রাতে? এটা দোষ নয়? সবাইকে যে এত ভাবিয়ে মারলে, এটাও দোষ নয়?

—কিন্তু তুমিই তো আমাকে যেতে বললে!

—বা রে ছেলে বা! শেষটা আমার ঘাড়েই সব দোষ চাপাবার চেষ্টায় আছ?

—সত্যি বলছি বিন্দু, আমি বনমালাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম!

—বনমালা, বনমালা, বনমালা! শুনে শুনে কানঝালাপালা হয়ে গেল বাছা! এখন ভেতরে এসো, সারাদিন অন্ন জোটেনি তো?

বাড়ির ভিতর থেকে মোক্ষদার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে শোনা গেল–বিন্দি! সদরে দাঁড়িয়ে অতক্ষণ কী করছিস তুই? কে এসেছে?

বিন্দু চেঁচিয়ে বললে, এই যে মা, যাচ্ছি। তারপর গলা নামিয়ে ফিরে বললে, শুনছ তো পমিবাবু, তোমার খুড়িটিকে চেনো তো? এখন চটপট ভেতরে ঢুকে পড়ো!

কিন্তু পমি তবু নড়ল না। এইবারে বিন্দু ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠল, বলি, তুমি ভেতরে আসবে কি আসবে না?

এতক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে পমি বললে, আমি যাচ্ছি। কিন্তু বনমালা এসেছে যে।

বিন্দু সচমকে বললে, কে?

—বনমালা।

বিন্দু লণ্ঠনটা আবার তার মাথার উপরে তুলে ধরে এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগল, তারপর দেখতে পেলে এককোণে দেওয়ালে পিঠ রেখে একটি ছোট্ট মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে– ঠিক যেন কলে-পড়া একটি ভীত নেংটি ইদুরের মতো। সে বললে, ও কে?

—ওই তো বনমালা!

—ওমা, অবাক!

—আমি ওকে খুঁজে পেয়ে তোমার কাছে এনেছি। ও আমাকে ভালোবাসে কিনা?

বিন্দু গলা চড়িয়ে বললে, তুমি খেপে গিয়েছ।

—কেন?

—তুমি ভেবেছ কি? তুমি কি ভেবেছ পথ থেকে যাকে পাবে, তাকেই কুড়িয়ে নিয়ে আসবে?

এই কথা শুনেই অভাগিনী বনমালা দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে পায়ে পায়ে এগিয়ে অন্ধকারের ভিতরে আবার মিলিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। সে একবারও আর পিছন ফিরে তাকালে না, কিন্তু পমি আর বিন্দু দুজনেই শুনতে পেলে তার চাপা-কান্নার অস্ফুট শব্দ!

বিন্দু তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেল এবং যেভাবে সে দৌড়ে গেল তা দেখলেই বোঝা যায় তার সমস্ত বুকের ভিতরটা উথলে উঠেছে গভীর সমবেদনায়।

বিন্দু বললে, কেন তুমি কাদছ বাছা? তোমার মতন এক-ফোটা ননির পুতুলকে এই অন্ধকারে আমি কি পথে বিসর্জন দিতে পারি। পমিবাবু, তোমার বন্ধুকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে চলো। বনমালা ফিরে দাঁড়াল।

বিন্দু জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কি মা-বাপ নেই এই রাতে পথে পথে কেন তুমি একলা বেড়াচ্ছ?

—বনমালা মাথা হেট করে বললে, আমার কেউ নেই!

বিন্দু তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললে, চলো বাছা বাড়ির ভেতরে, আমি তোমাকে আমার ঘরে লুকিয়ে রাখব।

সদর বন্ধ করে বিন্দু তাদের নিয়ে বাড়ির ভিতরে গেল। বনমালাকে আগে নিজের ঘরে শুইয়ে রেখে সে বললে, এইখানে থাকো, আমি একটু পরেই আবার ফিরে আসছি। গিন্নি ঘুমোলেই তোমার জন্যে খাবার আনব।

পমি বললে, আর আমার কী হবে?

—সবুর করো, সবুর করে! তুমি রান্নাঘরে যাও। আমি ঠাকরুণকে ঠান্ডা করে আসি।

পমি বললে, শিগগির এসো বিন্দু, আমার পেট খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে?

বিন্দু চলে গেল। কিন্তু পমি রান্নাঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। খুড়ির মতামত জানবার জন্যে তার মন অধীর হয়ে উঠল। অদৃষ্টে কী আছে আগে থাকতে তা জেনে সে প্রস্তুত হয়ে থাকতে চায়। পমি পা টিপে টিপে উপরে মোক্ষদার বসবার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

পাড়ায় কী কী নতুন ঘটনা ঘটছে, যদুবাবুর মুখ থেকে মোক্ষদা তখন সেইসব সবিস্তারে শ্রবণ করছিলেন। বিন্দুকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, হ্যাঁ লা বিন্দি, সদরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধরে কী হচ্ছিল?

—আমি তো রান্নাঘরে ছিলুম!

—রান্নাঘরে ছিলে? সেখানে আর কে আছে?

—আর কেউ নেই।

—দেখ বিন্দু, বাজে কথায় তুই আমায় ভুলোতে পারবিনি। সেই অকালকুষ্মাণ্ডটা ফিরে এসেছে, আমি বুঝেছি!

—বিন্দু চুপ।

—তুই জবাব দিচ্ছিস না কেন?

—কী জবাব দেব?

—সে ছোড়া এসেছে কি না? সত্যি বল। এসেছে তো?

বিন্দু এমন মৃদুস্বরে বললে, হুঁ যেন, তা শোনাল ঠিক একটি দীর্ঘশ্বাসের মতো।

—তাকে এখুনি আমার কাছে নিয়ে আয়!

—বেচারি ভয়ে কেঁপে সারা হচ্ছে, মা!

—যাতে তার সত্যিই ভয় হয়, আজ আমি তাই করব! নিয়ে আয় তাকে!

বিন্দু বললে, মা, পমির দোষ নেই। পমিকে আমিই বাইরে যেতে বলেছিলুম। আমি যে ঠাট্টা করে বলেছিলুম, পমি তা বুঝতে পারেনি।

মোক্ষদা সোজা হয়ে খনখনে গলায় বললেন, চুপ! তোর কোনও কথা শুনতে চাই না আমি তাকে নিয়ে আয় আমার কাছে!

মোক্ষদার ধমক থেকে বিন্দুকে বাঁচাবার জন্যে পমি হঠাৎ দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল। তারপর বললে, খুড়িমা, এই যে আমি।

পমি নির্বাসনে গেল

ঘরের ভিতরে পমির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষদা আশ্চর্যরকম চুপ হয়ে গেলেন।

যদুবাবুও এমনভাবে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন এ ঘরের কোনও কিছুর সঙ্গে তার কোনওই সম্পর্ক নেই।

দীর্ঘস্থায়ী স্তব্ধতা! বিন্দু যেন একটা কিছু করবার জন্যেই হাতের হরিকেন লণ্ঠনটা একবার এখানে একবার ওখানে সরিয়ে সরিয়ে রাখতে লাগল।

তারপর মোক্ষদা গাত্রোত্থান করলেন। পমি তাকিয়ে রইল মাটির দিকে। মোক্ষদা তার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ পমির র‍্যাপারের একটা কোণ ধরে মোক্ষদা বললেন, কী এটা?

পমি চোখ না তুলেই বিড়বিড় করে বললে, র‍্যাপার।

—কে দিল তোকে?

—একটি মেয়ে।’

—এখুনি এটা খুলে ফেল!

—আমার বড্ড শীত করছে!

—খোল বলছি!

পমি তবু স্থির।

মোক্ষদা র‍্যাপার ধরে মারলেন এক টান! পমি যা ভয় করছিল, তাই হল। র‍্যাপার গেল উড়ে, বেরিয়ে পড়ল তার নগ্ন দেহ!

প্রথমটা মোক্ষদার চক্ষুস্থির! তারপর তার দুই চোখ হল ছানাবড়ার মতো। ভীষণ স্বরে তিনি বলে উঠলেন, অ্যাঃ! তুই ল্যাংটা!

পমি বোবা।

—তোর পোশাক কোথায় গেল?

পমি তবু কথা কয় না।

—তুই যদি কথা না বলিস তাহলে মারের চোটে আজ তোর ভূত ভাগিয়ে দেব! সঙ্গে সঙ্গে মারের প্রথম নমুনা পড়ল চটাস করে পমির গণ্ডদেশের উপরে।

পমি গালে হাত বুলোতে বুলোতে কাতরস্বরে বললে, আমার পোশাক চুরি গিয়েছে?

—ডাহা মিথ্যে কথা!

—সত্যি বলছি খুড়িমা, চোরে আমার সব নিয়ে পালিয়েছে?

—চুপ কর মিথুক! আমি আর তোর খুড়িমা নই! যে কুলাঙ্গার ছেলে আমার মুখে চুনকালি মাখাতে চায়, তার সঙ্গে আর আমার কোনও সম্পর্ক নেই!

বিন্দু বললে, আহা, চোরে যদি চুরি করে, ও-বেচারির দোষ কী?

চোখ পাকিয়ে বিন্দুর দিকে তাকিয়ে মোক্ষদা ক্যাক ক্যাক করে বললেন, থাম, থাম! তুই আর মুখনাড়া দিসনে বিন্দু তারপর আবার পমির দিকে ফিরে বললেন, আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে! ভেবেছিলুম জীবনের শেষ ক-টা দিন শান্তিতে কাটাব, তা তোর মতন হতচ্ছাড়া এ সংসারে থাকলে আমার সে আশাতেও পড়বে ছাই! তোকে যে শাস্তি দেওয়া উচিত দয়া করে তা আর দিলুম না, কিন্তু এ বাড়িতে আর তোর ঠাঁই নেই। আজ রাতটা তুই কয়লার ঘরে বন্ধ থাকবি, তারপর কাল সকালে তোকে একেবারে শহর থেকে দূর করে দেব!

বিন্দু প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে গেল, সে কী মা–

মুখ ঝামটা দিয়ে মোক্ষদা বলে উঠলেন, বিন্দি, ফের কথা কইছিস? কী করলে ও ছোড়ার স্বভাব শুধরোবে তোর চেয়ে তা আমি ভালো জানি! আমার বাপের বাড়ির দেশ থেকে নিমাই এসেছে। দেশে নিমাইয়ের অনেক খেত-খামার আছে, পমি তারই সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। যেমন ওর চাষাড়ে-বুদ্ধি, ও চাষ-বাসই করতে শিখুক! শহরে থাকলে ও একেবারে গোল্লায় যাবে। নিমাই কাল সকালেই দেশে ফিরবে, পমিও যাবে তার সঙ্গে।

পমি ম্রিয়মান মুখে বললে, কিন্তু–

মোক্ষদা বাধা দিয়ে বললেন, চোপরাও! তোর কোনও মিছে কথাই আর শুনতে চাই না! চল তুই আমার সঙ্গে। বলেই তিনি পমির কান চেপে ধরলেন।

বিন্দু বললে, ওকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ মা? বেচারা আজ সকাল থেকে একটা কুটাে পর্যন্ত মুখে দেয়নি!

মোক্ষদা বিন্দুর কথার কোনও জবাব দেওয়ারও দরকার মনে করলেন না! তিনি পমির কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে তাকে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

কয়লার ঘরটা হচ্ছে চওড়ায় আড়াই হাত আর লম্বায় তিন হাত। সেখানে বাড়ির কয়লা জমা করে রাখা হত। তার জানলা ছিল না, একটা মাত্র দরজা ছিল। কয়লার গাদার ভিতরে পমিকে নিক্ষেপ করে মোক্ষদা দরজাটা বন্ধ করে দিলেন সশব্দে।

সকালবেলা। নিমাইয়ের সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে পমি বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল।

মোক্ষদা প্রথমটা কঠিন মুখে চুপ করে রইলেন। তারপর নীরস স্বরে বললেন, 'এসো। ...যেদিন আবার ভালো ছেলে হবে, সেদিন আবার তোমাকে এখানে ঠাঁই দেব, কিন্তু তার আগে নয়। বংশের গৌরব হবার জন্যে প্রত্যেক ছেলের চেষ্টা করা উচিত। মন দিয়ে কাজকর্ম শেখো, মানুষের মতন মানুষ হও।

বারবার এক কথা শুনে শুনে এতক্ষণে পমিরও বিশ্বাস হল নিশ্চয়ই সে ভালো ছেলে নয়, নিশ্চয়ই সে বংশের কলঙ্ক! তার প্রতি কঠোর হয়ে খুড়িমা কিছুই অন্যায় করেননি।

সে কাচুমাচু মুখে বললে, খুড়িমা, আমায় মাপ করো!

—কাজকর্ম শিখে মানুষ না হলে তোমাকে আমি মাপ করব না?

—খুড়িমা, তুমি যদি আমায় মাপ করো, তাহলে আজ থেকেই আমি ভালো ছেলে হব।

—ও! তুমি ভেবেছ খোসামোদ করে আমার মন ফেরাবে? না, আমার যে কথা সেই কাজ! শাস্তি না দিলে তুমি মানুষ হবে না! নিমাই, একে নিয়ে যাও।

পমি আবার মোক্ষদার পায়ের ধুলো নিয়ে ভরলে, খুড়িমা তুমি কি আমাকে একটা চুমুও খাবে না?

—চুমু! বুড়ো ছেলেকে চুমু খাব কী রে! যা, যা, আর জ্বালাস নে!

নিমাই এদিকে এসে পমির হাত ধরে অগ্রসর হল। পমি যেতে যেতে ফিরে কাঁদতে কাঁদতে বললে, বিন্দু আমি তাহলে আসি? বিন্দু, তুমি আমাকে চিঠি লিখো।

বিন্দুর মুখ দিয়ে কোনও কথা ফুটল না, তার গলা দিয়ে বেরুল খালি একটা ঘড়ঘড় শব্দ। তারপর সে আঁচলের খুঁট দিয়ে মুছতে লাগল নিজের চোখের জল।

যেতে যেতে পমি করুণ চোখে চারিদিকে তাকাতে লাগল। বাড়ির সমস্ত দরজা-জানালা, উঠোনের বকুলগাছটি, রান্নাঘরের সামনে বসে মেনি বিড়ালটি, ছাদের কানির্শে বসে গোলাপায়রাগুলি, সবাই যেন একসঙ্গে বলতে লাগল, বিদায় পমি! বিদায় পমি! বিদায় পমি! বুকের ভিতর থেকে পমির প্রাণও যেন উত্তরে বললে, বিদায় ভাই, বিদায়, বিদায়! পথে বেরিয়ে স্টেশনের দিকে যেতে নিমাই শুধোল, পমি তোমার বয়স কত?

—ছয় কি সাত।

—তুমি কার ছেলে?

—আমি আমার মায়ের ছেলে।

দুই ভুরু কপালে তুলে নিমাই বললে, সত্যি নাকি! তুমি কতদূর গুনতে জানো?

—এক হাজার পর্যন্ত।

—খাসা! আমাকে একবার গুনে শোনাও দিকি?

—এক, দুই, তিন, চার, আট, দশ, পঁচিশ, আটত্রিশ–

নিমাই বাধা দিয়ে বললে, থাক, বুঝেছি! তুমি ইস্কুলে গিয়েছিলে!

—হুঁ!

—বলো দেখি মোহরের সঙ্গে গিনির তফাত কী?

পমি খানিক ভাবলে, তারপর বললে, মোহর হচ্ছে মোহর, আর যা দিয়ে গয়না গড়া হয় গিনি হচ্ছে তাই!

নিমাই চমকে বললে, বাঃ! আচ্ছা, বলো দেখি, তরমুজ ফলে কীসে?

এ রকম সব প্রশ্ন পমিকে আগে কেউ কখনও করেনি। সে থতমত খেয়ে প্রকাশ্যেই ভাবতে লাগল, আমগাছে ফলে আম, জামগাছে ফলে জাম, আলুগাছে ফলে আলু, আর তরমুজগাছে ফলে তরমুজ!

নিমাই হতাশভাবে বললে, হে ভগবান, মোক্ষদা ঠাকুরুণ এ কাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন? ওহে ছোকরা, তুমি যে গাধার বাচ্চার চেয়েও বোকা! তুমি বলছ, তরমুজগাছে ফলে তরমুজ, না? তরমুজ যে ঘাসের ডগায় ফলে না, এটা তুমি ঠিক জানো তো?

পমি বললে, ঘাসের ডগায় ফোটে, ঘেসো ফুল। সেখানে তরমুজ ফলবে কেন?

—সেই কথাই তো তোমায় আমি জিজ্ঞাসা করছি?

—তরমুজগাছ হচ্ছে এক রকম গাছ।

—বাহবা কী বাহবা! তরমুজগাছ হচ্ছে একরকম গাছ বেশ, এবার রোদ উঠলে তুমি তার ছায়ায় গিয়ে বসে থেকে। হ্যাঁ, তোমার বিশ্বাস, আলুগাছে ফলে আলু? ঠিক বলেছ! কিন্তু কী করে আলুগুলো পাড়তে হয় বলো দেখি?

—কেন, গাছের ওপরে চড়ে।

নিমাই হা হা হা হা করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। তারপর অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললে, যাক, তোমাকে আর প্রশ্ন করা মিছে! গাড়ির সময় উৎরে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি পা চালাও।

স্টেশনের কাছে এসে পমি বললে, আমাকে কি কাল থেকেই খেতের কাজ শিখতে হবে?

নিমাই নাক বেঁকিয়ে বললে, খেতের কাজ? বিষ্ণু, বিষ্ণু! তুমি হচ্ছ একটি আস্ত গোরু! তোমাকে দেব গোরু চরাবার ভার!

পমির কপাল খারাপ

দিন কয় পরে পমি গোরু চরাবারই ভার পেলে।

পমি বললে, নিমাইবাবু, আপনি আমাকে জুতো দিলেন না, আমি খালি পায়ে হাঁটব কেমন করে?

নিমাই বললে, এটা শহর নয়, পাড়া গাঁ। রাখাল ছেলেরা জুতো পরে না।

পমির উপরে পড়ল দশটা গোরুর ভার। তাদের শিংগুলোর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে সে বললে, ওরা যদি আমাকে গুতিয়ে দেয়।

—ওদের কাছে গেলেই ওরা তোমাকেও গোরু বলে চিনতে পারবে। গুতিয়ে দেবে না।

নাচারভাবে পমি পাচন বাড়ি হাতে নিয়ে গোরুদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গোরুরা চিরদিনই রাখাল বালকদের দ্বারা চালিত হয়। কাজেই পমিকে দেখে বিস্ময় বা বিরাগ প্রকাশ করলে না।

নিমাই বললে, সাবধান, আমার গোরু যেন হারায় না। একটা গোরু হারালেই এখানে আর তোমার ঠাঁই নেই। এখন যাও।

পমি গোরুর পাল নিয়ে অগ্রসর হল। শহুরে ছেলে সে, পল্লিগ্রাম লাগল তার নতুন। কী চমৎকার রৌদ্র-রঞ্জিত দৃশ্য! নীলাকাশ মিলিয়ে গিয়েছে তেপান্তরের শেষে, ধু ধু প্রান্তর মিলিয়ে গিয়েছে নীলাকাশের কোলে। এখানে কূলে কূলে ভরা দিঘি, ওখানে রোদে চিকমিকে নদী, কোথাও সবুজ মুকুট-পরা বড়ো বড়ো গাছের সভা, কোথাও অজানা বনফুলে ভরা ছোটো ছোটো ঝোপঝাড়! দিকে দিকে নব নব রূপ, গাছে গাছে অচেনা পাখিদের গান, পদে পদে কত যে বিস্ময়!

পমির চোখ জুড়িয়ে গেল, মন হল মুগ্ধ। পল্লিগ্রাম যে এত সুন্দর তা সে জানত না। এক জায়গায় প্রায় একশো ফুট উচু পাহাড়ের মতন প্রকাণ্ড একটা

টিপি। স্থানীয় লোকেরা সেটাকে ‘রাজারগড়’ বলে ডাকত। হয়তো সুদূর অতীতে সেটা সত্যসত্যই ছিল কোনও রাজার কেল্লা। এখন সেটা মৃত্তিকা স্তূপে পরিণত হয়েছে এবং তার উপরে গজিয়েছে ঘাস ও জঙ্গল।

স্তূপের ঢালু গা বেয়ে গোরুগুলো উপরে উঠছে দেখে পমিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠতে লাগল। ছোট্ট মানুষ, ছোট্ট ছোট্ট হাত-পা! শেষ পর্যন্ত পমি যখন টঙে উঠে দাঁড়াল, তখন রীতিমতো হাঁপাচ্ছে।

আরে গেল, গোরুগুলো যে আবার স্তূপের ওধারকার ঢালু বেয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করলে।

পমির আর দম নেই। সে দু-পা ছড়িয়ে বসে পড়ে হাঁপ ছাড়তে ছাড়তে দেখতে লাগল, স্তূপের নীচে ওধারে রয়েছে গভীর জঙ্গল। তার মনে হল, ওইরকম কোনও গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়েই রূপকথার রাজকুমার ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়েছিল রক্ষোপুরীর বন্দিনী রাজকন্যার খোঁজে।

গোরুগুলো যখন স্তূপের মাঝ-বরাবর নেমে গিয়েছে, পমি আবার উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হল। তারপর সে-ও যেই নীচের দিকে পা বাড়িয়েছে অমনি তার পায়ে পট করে কী ফুটে গেল! আর্তনাদ করার সঙ্গে সঙ্গেই টাল সামলাতে না পেরে সে খেলে এক আছাড় এবং তারপর গড়াতে গড়াতে নামতে লাগল নীচের দিকে!

গোরুগুলো সচমকে উর্ধ্বমুখে তাকিয়ে দেখলে, তাদের রাখাল এক অদ্ভুত উপায়ে উপর থেকে নেমে আসছে! এমনভাবে আর কোনও রাখালকে তারা স্তূপ থেকে নামতে দেখেনি। মহা ভয়ে গোরুগুলো ল্যাজ তুলে যে যেদিকে পারলে চম্পট দিলে।

গড়াতে গড়াতে পমি যখন ভাবছে তার জীবনের শেষ দিন উপস্থিত, হঠাৎ সে ঝুপ করে পড়ে স্থির হয়ে রইল এক জায়গায় গিয়ে। তার একটুও চোট লাগল না।

স্তূপের নীচে ছিল প্রায় জলশূন্য কাদায়-ভরা একটা ডোবা। সৌভাগ্যক্রমে পমির দেহ গিয়ে পড়েছে তারই ভিতরে, নইলে তার গতর নিশ্চয় চূর্ণ হয়ে যেত।

পমি প্রথমটা চোখ মেলে দেখতে লাগল খালি হাজার হাজার সর্ষে ফুল। তারপর সে অনেক কষ্টে ডোবার ভিতর থেকে উপরে শুকনো মাটিতে উঠে এসে বসল। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, কোথাও একটা গোরুর চিহ্ন পর্যন্ত নেই! ভয়ে তার বুক ঢিপ করে উঠল। একটা-দুটো নয়, দশ-দশটা গোরু যদি হারিয়ে যায়, তাহলে নিমাইয়ের হাতে তার যে নাকালের আর শেষ থাকবে না।

তাড়াতাড়ি গায়ের কাদা ঝেড়ে ও চেছে ফেলে সে উঠে পড়ে আবার গোরুর সন্ধানে ছুটল।

কিন্তু কোথায় পথ? এ জায়গাটা একেবারে পোড়ো, এদিকে কোনও লোক আসে না। তবে কি গোরুগুলো ওই জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে? ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে পমি নিজের মনেই বললে, দেখা যাক!

সে অরণ্যের ভিতর গিয়ে ঢুকল। প্রথম খানিকটা বনের ঝোপঝাপ ও গাছপালা পরস্পরের কাছ থেকে তফাতে তফাতে ছিল, কিন্তু পমি যতই ভিতরে ঢোকে, জঙ্গল ততই নিবিড় হয়ে ওঠে। খানিকক্ষণ পরে সে মুখ তুলে দেখলে অরণ্য এমন ঘন হয়ে উঠেছে যে, মাথার উপরে আকাশও দেখা যায় না। তখন ভয় পেয়ে আবার ফেরবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কোন দিক দিয়ে যে এসেছে, সেটা আর আন্দাজ করতে পারলে না। সেদিকেই যায়, সামনে পায় কাটাভরা ঝোপঝাপ আর মাথার উপরে নিবিড় সবুজ পাতার জগৎ। সেখানে আলোও নেই অন্ধকারও নেই, সেখানে বাস করে যেন চিরস্থায়ী সন্ধ্যা!

ঠিক যেন গোলকধাঁধায় পড়ে পমি চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল–সে বাইরের দিকে যাচ্ছে না, জঙ্গলের আরও ভিতর দিকে যাচ্ছে তাও বুঝতে পারলে না। কাটাঝোপে তার জামাকাপড় গেল ছিড়েখুড়ে ও সর্বাঙ্গ গেল ক্ষতবিক্ষত হয়ে। এইভাবে পমি যে কতক্ষণ পাগলের মতন ঘুরে বেড়ালে, তা সে নিজেই আন্দাজ

করতে পারলে না। কেবল এইটুকু বুঝলে যে, জঙ্গলের ভিতরে সন্ধ্যার আবছায়া ক্রমেই অন্ধকারে পরিণত হচ্ছে।

তারপরেই শুনতে পেলে অনেক–অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে চার-পাঁচটা শাঁখের আওয়াজ! কোনও গ্রামে শাঁখ বাজছে। তাহলে জঙ্গলের বাইরেও নেমে এসেছে সন্ধ্যা?

পমির বুকটা ছাৎ করে উঠল! সর্বনাশ, আজ রাত্রে তাকে জঙ্গলের মধ্যেই বন্দি হয়ে থাকতে হবে নাকি? এই গহন বন, দিনেও যেখানে অন্ধকারের বাসা, রাত্রে না জানি সেখানে জেগে উঠবে আরও কতই বিভীষিকা! হয়তো এখানে বাঘ আছে, সাপ আছে, আর আছে না জানি কত ভূত-পেত্নীর দল, রাত্রে এইখানে থাকলে সে কি আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে? এরই মধ্যে দিকে দিকে বেজে উঠেছে ঝিঁঝিঁদের কণ্ঠস্বর–যেন আঁধার দানবেরা শিস দিচ্ছে! গাছের পাতায় পাতায় শোনা যাচ্ছে যেন কাদের ফিসফিস করে কথা! হঠাৎ আচম্বিতে পমির দেহে রোমাঞ্চ জাগিয়ে কোন গাছের টং থেকে ককিয়ে কাদতে শুরু করে দিলে অনেকগুলো খোকাখুকি। পমির দৃঢ়বিশ্বাস হল, রাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভূত-পেতনিদের খোকাখুকি জেগে উঠে খাবারের জন্যে কান্না জুড়ে দিয়েছে। পমি এর আগে কখনও পাড়াগায়ে আসেনি, সে জানে না, বকেদের ছানাগুলো যখন চ্যাচায় তখন মনে হয় যেন মানুষের শিশুরা কেঁদে কেঁদে উঠছে।

পমি সেইখানেই কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল, তার চোখ দিয়ে পড়তে লাগল ঝর ঝর করে জল। কাদতে কঁদিতে দুই হাত জোড় করে কাতরকণ্ঠে বললে, হে ভগবান, হে ভগবান, আমি তোমার পমি। আমার মা নেই, বাপ নেই, আমার খুড়িমাও কাছে নেই! এখন তুমি ছাড়া আমাকে কে দেখবে, হে ভগবান? আমাকে দয়া করো, আমাকে পথ দেখাও, আমাকে ভূত-পেতনির হাত থেকে তুমি উদ্ধার করো।

এইভাবে ভগবানকে ডাকতে ডাকতে হঠাৎ পমির চোখে পড়ল অনেক দূরে টিম টিম করে একটা আলো জ্বলছে। সেই আলোটা দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে আর কোনও দিকে না তাকিয়ে পমি সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। তার মনে হল, ভগবানের দয়ায় বনজঙ্গল যেন দুই দিকে সরে গিয়ে তার জন্যে পথ করে দিলে।

অন্ধকারে পমি এতক্ষণ বুঝতে পারেনি, যেখানে বসে সে ভগবানের কাছে আবেদন জানাচ্ছিল সেটা হচ্ছে অরণ্যের একটা প্রান্ত। বনের একটা দিক সেইখানে শেষ হয়েছে, তারপরেই একটা মাঝারি আকারের মাঠ এবং সেই মাঠের ওপারে কোনও গৃহস্থের ঘরে জ্বলছে একটি দীপের শিখা। সেই দীপশিখাই আজ পমির প্রাণ বাঁচালে, কারণ বনের ভিতরে রাত কাটাতে হলে নিশ্চয় সে আজ ভয়েই মারা পড়ত।

আলোটা লক্ষ্য করে পমি মাঠের উপর দিয়ে যতটা তাড়াতাড়ি পারে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু যেখানে আলো জ্বলছে সেখান পর্যন্ত তাকে আর যেতে হল না। হঠাৎ মাঝপথেই ঘটল আর এক আশ্চর্য ঘটনা!

মধুমতী রাজার মেয়ে

সেদিন ছিল প্রতিপদ। মাঠ দিয়ে হাঁটতে হাটতে হঠাৎ আলোর আভাস অনুভব করে, পূর্ব দিকে মুখ ফিরিয়ে পমি দেখলে কটা গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঁকিঝুঁকি মারছে। চাঁদকে দেখে সে আরও আশ্বস্ত হল।

কিন্তু তখনই আর-একটা শব্দ তার কানে গেল। কোথা থেকে খুব কচি শিশুর গলায় কে যেন করুণ সুরে কাঁদছে!

পমির বুক আবার ঢিপ ঢিপ করে উঠল! এখানেও শিশুর কান্না? ভূত-পেতনিদের ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েগুলো কি গাছ থেকে নেমে এসে তার পিছু ধরতে চায়? সে থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কান পেতে শুনতে লাগল।

কিন্তু না, এ কান্না শুনে তো ভয় হয় না, এ যে সত্য সত্যই মানুষ-শিশুর গলা! অন্ধকারে তার মতন পথ ভুলে আরও কোনও শিশু কি এইখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

পমি আবার শুনলে, কে যেন আধো আধো ভাষায় কাঁদতে কাঁদতে বলছে, চাঁদেল বুলি, চাদেল বুলি, আমাকে বালিতে নিয়ে দাও।

পমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আন্দাজ করবার চেষ্টা করলে, আওয়াজটা আসছে কোনখান থেকে? চাঁদের মুখ ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে এবং অন্ধকার হয়ে আসছে ক্রমেই পাতলা। মাঠের মাঝে মাঝে রয়েছে গাছপালা এবং মাঝে মাঝে রয়েছে ছোটো-বড়ো ঝোপ।

পমি বুঝলে, শিশু বলছে–চাঁদের বুড়ি, আমায় বাড়ি নিয়ে যাও! এবার আন্দাজে ধরলে, শব্দটা আসছে কোন দিক থেকে। সে পূর্ব দিকের একটা ঝোপ লক্ষ্য করে পায়ে পায়ে এগুতে লাগল।

ঝোপের ওপাশে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখলে, একটি এতটুকু ফুটফুটে মেয়ে ঘাসজমির উপরে বসে সামনের দিকে দুই হাতে ভর দিয়ে চাঁদের দিকে

চেয়ে আছে! যেন বনদেবীর কন্যা! এ এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়! এই রাতে এই গহনবনের ছায়ায়, নিরালা মাঠের বিজনতার মধ্যে যে এমন একটি খুকির দেখা পাওয়া যেতে পারে, এটা কল্পনাতেও আনা যায় না। পমি মিনিট দশেক অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ছয়-সাত বছর বয়সের ছেলের পক্ষে পমির দেহ ছিল মাথায় বেশ খাটো। কিন্তু তারও তুলনায় এ মেয়েটিকে দেখতে ছোটো, কত ছোটো! যেন জুঁইফুলের একটি পাপড়ি! একটি টুকটুকে লাল জামা প্রায় তার পা পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে, এলানো চুলগুলির উপরে একটি লাল ফিতার 'বো' , দুই পায়েও ছোট্ট দু-পাটি লাল জুতো। গলায় ও হাতে চাঁদের আলোয় চক চক করছে সোনার হার, সোনার চুড়ি।

তাকে দেখলেই বুঝতে দেরি লাগে না যে, সে বড়োঘরের মেয়ে। তার বয়স কত হবে? চার? না, তিন? কিন্তু সে একলা এমন অসময়ে এ জায়গায় এল কেমন করে?

মেয়েটি হঠাৎ পমিকে দেখতে পেলে। সঙ্গে সঙ্গে সে তখনই উঠে দাঁড়িয়ে তার কাছে, ছুটে এল–উড়ে এল যেন একটি রঙিন প্রজাপতি। সে পমির পানে তাকালে এবং পমি তাকালে তার মুখের পানে। নীরবতার মধ্যে কেটে গেল এক মিনিট। দুজনের চোখে মধুর বিস্ময়ের আভাস!

মেয়েটি শুধোলে, তুমি কি চাঁদেল বুলিল থেলে?

প্রথমটা পমি বুঝতে পারলে না। তারপর একটু ভেবে বুঝলে, মেয়েটি জানতে চাইছে সে চাঁদের বুড়ির ছেলে কি না?

মুখ টিপে হেসে বললে, না, আমি চাদের বুড়ির ছেলে নই। তুমি কে?

মেয়েটি টেনে টেনে বললে, আমি ম-ওদুমতী!

—তুমি মধুমতী? বাঃ, বেশ নাম!

—আমাল বাবা লাজা?

—তোমার বাবা, রাজা?

—হুঁ।

—তুমি এখানে কেন?

—পালিয়ে এথেথি।

—পালিয়ে এসেছ? একলা?

—হুঁ।

—কেন?

—চাঁদেল বুলিকে দেকতে।

—কাঁদছিলে কেন?

—চাঁদেল বুলি নেই। আমি বালি দাবো।

—তোমার বাড়ি কোথায়?

খুব জোরে মাথা-নাড়া দিয়ে মধুমতী বললে, দানি না!

—জানো না তো বাড়ি ফিরবে কেমন করে?

ননির মতন নরম হাতে পমির একখানি হাত ধরে মধুমতী গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বললে, তুমি নিয়ে দাবে!

পমি মনে মনে হেসে ভাবলে, আমি নিজেই পথ ভুলে বাসার খোঁজ পাচ্ছি না, আর তুমি আমাকেই বলছ কিনা তোমার বাড়ি খুঁজে দিতে!

এতক্ষণ পরে মধুমতীর খেয়াল হল, পমিরও নামটা জিজ্ঞাসা করা উচিত! সে শুধোলে, তোমাল নাম কী?

—পমি।

এ নাম মধুমতীর পছন্দ হল না। সে ঘাড় নেড়ে বললে, না, তুমি থুপী?

—আমার নাম পমি।

—উঁ, তুমি থুপী!

পমি বুঝলে, প্রতিবাদ এখানে অচল। বললে, বেশ, তাই সই। চলো, তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাই।

দুজনে হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হল!

মধুমতী হঠাৎ বললে, দান দাও!

—কী?

—দান দাও!

—বুঝতে পারছি না!

মধুমতী এ কথাকে ওজর বলেই গ্রাহ্য করলে না। মাটিতে পা ঠুকে অধীর স্বরে সে আবার বললে, দান দাও?

—ও, গান গাইতে বলছ বুঝি! কিন্তু আমি গান জানি না যে!

মধুমতী এবারে রেগে ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, দান দাও, দান দাও।

ফাঁপরে পড়ে ভাবতে ভাবতে পমির হঠাৎ মনে পড়ে গেল বিন্দুর মুখে শোনা একটি গান। সে গাইলে,

এক যে ছিল কেলে বেড়াল
মুখখানা তার হাঁড়িপানা,
রান্নাঘরে লুকিয়ে ঢুকে
চুরি করে খায় সে খানা।
ম্যাও-তান তার শুনে হঠাৎ
কুত্তা জিমির মেজাজ চটাৎ,
ক্যাক করে সে কামড়ে দিলে,
অমনি হুলোর চোখটা কানা।

মধুমতীর পছন্দ হল না। বললে, থাই দান!

—ছাই গান? কিন্তু আমি যে আর গান জানি না? কিন্তু সেজন্যে মধুমতীর আর মাথাব্যথা নেই, তার মন ছুটেছে অন্যদিকে। সে হঠাৎ বললে, পুল, পুল!

—অ্যাঃ?

পুতুলের মতন একরত্তি হাতখানি তুলে একদিকে বাড়িয়ে সে বললে, ওই পুল পুতেচে। আমায় পুল দাও!

ধবধবে জ্যোৎস্নায় একদিকে চেয়ে পমি দেখলে, বাতাসে দুলছে নয়নতারা ফুলের ঝোপ। মধুমতীর মন রাখবার জন্যে সে অনেকগুলো ফুল তুলে এনে তার হাতে সমর্পণ করলে।

ঘ্রাণ নিয়ে ভুরু কুঁচকে মধুমতী মতপ্রকাশ করলে, দন্দ নেই!

—নয়নতারা ফুলে তো গন্ধ থাকে না!

—দ্যেৎ? বলে মধুমতী ফুলগুলো ছুড়ে ফেলে দিলে, তারপরেই আবার বললে, থুপী!

—বলো?

—আমি খাবাল খাব!

মনে মনে প্রমাদ গুনে পমি বললে, খাবার? এখানে তো খাবার পাওয়া যায় না দিদি! কিন্তু কে বোঝে সে কথা? খাবাল খাব, খাবাল খাব বলে বায়না ধরে মধুমতী প্রথমে বসে, তারপর মাঠের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর ক্রমাগত দুই পা ছোড়ে আর বলে, খাবাল খাব, খাবাল খাব!

পমি বললে, লক্ষ্মী মেয়ে, ওঠে তো! বাড়ি গিয়ে খাবার খাবে!

—উ-উ-উ-উ, আমি বালি দাব না, আমি খাবাল খাব!'তারপর সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না ধরলে।

নাচারের মতন মধুমতীর পাশে বসে পড়ে পমি তার কান্না শুনতে লাগল। আর ভাবতে লাগল, রাজার মেয়ে মধুমতীকেও খাবারের জন্যে কাঁদতে হয়।

তারও খুব ক্ষুধা পেয়েছিল, কিন্তু মধুমতীর কাতরতা দেখে সে নিজের কথা ভুলে গেল।

কেঁদে কেঁদে শেষটা মধুমতী ঘুমিয়ে পড়ল।

উপরে, নীচে চারিদিকে বয়ে যাচ্ছে তখন জ্যোৎস্নার হিরার ধারা। কিন্তু সে সৌন্দর্য দেখবার ও বোঝবার মতন অবস্থা পমির ছিল না। কারণ রাত যত বাড়ছে, তত ঠান্ডা হচ্ছে শীতের হাওয়া।

কন-কন-কন-কন! শীত ছুড়ছে বরফের তির!

থর-থর-থর-থর! কেঁপে কেঁপে উঠছে পমির বুকের ভিতরটা পর্যন্ত! তার হাত-পা ক্রমে অসাড় হয়ে এল।

পমি বুঝলে, এমন চুপ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে শীত বাড়বে বই কমবে না। চাঙ্গা হবার জন্যে সে তখন উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে খুব খানিকটা ছুটোছুটি করে নিলে।

হ্যাঁ, এতক্ষণ পরে দেহের রক্ত যেন কতকটা গরম হয়ে উঠল। পমি আবার একটু ধাতস্থ হয়ে মধুমতীর পাশে এসে বসল।

মধুমতী ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও আবার উ-উ-উ-উ করে কাঁদতে কাঁদতে ঠক ঠক করে কাপছে! তারও খুব শীত করছে নিশ্চয়!

পমির মন ভরে উঠল সমবেদনায়। নিজের মনে-মনেই সে বললে, আহা রে, রাজার মেয়ে, শোয়া অভ্যাস সোনার খাটে, পালকের বিছানায় দামি শাল-দোশালা গায়ে দিয়ে, এই হাড়-কাঁপানো শীতে, এই কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায়, এই শিশিরে স্যাৎসেঁতে মাটিতে একটিমাত্র জামা পরে সে ঘুমোতে পারবে কেন? কিন্তু উপায় কী, উপায় কী?

মধুমতীর ঘুম ভেঙে গেল, সে আবার উঠে বসে কাঁপতে কাঁপতে কান্না-ভরা গলায় ডাকলে, থুপী, অ থুপী!'

—কী মধুমতী?

—আমাল, থিত করতে?

—শীত করছে? ঘুমিয়ে পড়ো, আর শীত করবে না!

—ওগো মাগো, ওগো মাগো মধুমতীর কান্না ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল।

কী যে করবে কিছুই ভেবে না পেয়ে পমি হতাশ ভাবে ফ্যালফ্যাল করে চারিদিকে তাকাতে লাগল। কোনওদিনই সে পড়েনি এমন বিপদে!

চাঁদ উঠেছে আরও উঁচুতে। শিশিরে স্নান করে বাতাস হয়ে উঠেছে আরও ঠান্ডা। গানের পাখিরা এখন গান ভুলে যায়। জেগে জেগে চ্যাঁচায় প্যাঁচার দল, ডানা ঝটপটিয়ে সাড়া দেয় বাদুড়েরা, আর মাঝে মাঝে ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া বলে খবরদারি করে শেয়ালের পাল!

ওখানে ওই মস্তবড়ো স্তুপটা কীসের? ধবধবে চাঁদের আলোয় খানিকক্ষণ ধরে ভালো করে দেখে পমি বুঝতে পারলে, ও হচ্ছে খড়ের গাদা, চাষিরা ওখানে রাশি রাশি খড় সাজিয়ে রেখে গিয়েছে।

লোকে বলে, ডুবন্ত লোক ভাসন্ত খড়কুটো পেলেও সাগ্রহে চেপে ধরে। বিপদগ্রস্ত পমি খড়কুটোর বদলে পেলে একেবারে মস্ত খড়ের গাদা! এ যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পাওয়া!

সে পরম আহ্বাদে বলে উঠল, ওঠো মধুমতী, আমার সঙ্গে চলো!

মধুমতী ওঠে না, খালি কাঁদে। পমি তখন হাত ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে দিলে। তারপর সে মধুমতীর হাত ধরেই সেই স্তুপীকৃত খড়ের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল।

সে যখন খড়ের স্তুপের খুব কাছে এসে পড়েছে, হঠাৎ গাদার ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একটা মূর্তি।

চাঁদের আলোতেও স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিল না মূর্তিটাকে কিন্তু মনে হল, মানুষেরই মূর্তি বটে, তবু ঠিক যেন মানুষের মতন নয়! এই জঙ্গলভরা মাঠে, এই শীতার্ত নিঝুম রাতে কোনও মানুষের আবির্ভাব কি সম্ভবপর?

মূর্তির মুখখানা কফ্রির মুখের চেয়েও কালো! আর সেই মিশকালো মুখে জুলজুল করে জ্বলছে দুটাে ক্রুদ্ধ ও বিশ্রী চক্ষু এবং সার বাধা বিকট, ভয়াবহ ও হিংস্র দাঁতগুলো!

পমি গল্পে ভূতের কথা শুনেছে এবং রাত্রিবেলায় নিজেদের ঘরেই সে খাটের ধারে পা বুলিয়ে বসতে পারে না–পাছে খাটের তলা থেকে কোনও মাংসহীন কঙ্কাল অস্থি-বাহু বাড়িয়ে তার পা দুটো ধরে হিড়হিড় করে টেনে নেয়!

এই কি সেই ভূত? পমির সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, তার হাড়ে হাড়ে জাগল বিষম ঠকঠকানি– এবারে শীতে নয়, আতঙ্কে! মধুমতীও তীক্ষ্ণ স্বরে কেঁদে উঠে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে প্রাণপণে!

মূর্তিটা মস্ত মস্ত গোটাকয় লাফ মেরে খড়ের স্তুপের উপরে উঠে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তার সুদীর্ঘ এক লাঙ্গুল!

ওটা একটা হনুমান। শীতে বোধহয় খানিকটা গরম হবার জন্যেই খড়ের গাদার ভিতরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, এখন মনুষ্য-জাতীয় খোকা-খুকির অভাবিত আবির্ভাব দেখে বিরক্ত হয়ে দিলে লম্বা।

পমি আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল! সে মধুমতীকে নিয়ে খড়ের স্তুপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কতকগুলো খড়ের আঁটি টেনে টেনে বার করে তৈরি করলে বেশ একটি গুহার মতন জায়গা। তারপর সে মধুমতীকে নিয়ে তার ভিতরে গিয়ে ঢুকল এবং একটু পরেই দেহ তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে গেল দুষ্ট শীতের রক্ত জল করা বিষ দাঁত!

দেখতে দেখতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল মধুমতী।

সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর পমিরও চোখের পাতা ঘুমে ভরে এল। গুটিসুটি মেরে সে-ও মধুমতীর পাশে শুয়ে পড়ল, তারপর ধীরে ধীরে মুদে গেল তার চোখ দুটি।

বাহির থেকে তাদের উপরে পাহারা দিতে লাগল নীলাকাশের চাদ এবং তাদের কাছেকাছেই জেগে দুলতে লাগল ছোটো-ছোটো ঘাসের ফুল।

মুড়ি খেতে বড়ো ভালো লাগে

প্রখর আলোকে পমির ঘুম গেল ভেঙে। চোখ মেলে দেখে, আকাশে চাঁদ নেই, পূর্ব দিকে সূর্যের রাঙা মুখ।

তাড়াতাড়ি সে উঠে বসতে গেল, কিন্তু দেখলে মধুমতী তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে এখনও ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মধুমতীর ফোটা ফুলের মতন তাজা, মিষ্টি মুখখানি দেখে তার প্রাণের ভিতরটা স্নেহে আর মায়ায় দুলে দুলে উঠল!

পাছে তার ঘুম ভেঙে যায় সেই ভয়ে পমি আর উঠতে পারলে না, একেবারে স্থির ও আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইল। কাছেই একটি গাছের ডালে বসে বুলবুলি গাইছিল কোম তেপান্তরের, কোন বন-বনান্তের কোন ফুলন্ত গোলাপি স্বপ্নের গান! পমি চুপ করে শুয়ে তাই শুনতে শুনতে শীতকে ভোলবার চেষ্টা করতে লাগল।

তারপর ভাঙল রাজকন্যার ঘুম! পমি তাকে নিয়ে খড়ের গদার বাইরে এসে বসল। মোমের মতন নরম খুদে খুদে হাত দুখানি মুঠো করে নিজের চোখের পাতা রগড়ে দৃষ্টি মেলে সে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল বিপুল বিস্ময়ে। মাথার উপর প্রাসাদের ছাদ নেই, তার বদলে রয়েছে এই নীলাম্বর, এটা বোধহয় ছিল তার ধারণাতীত। মিহি সুরে হতভম্বের মতন সে ডাকলে, মা, ও-মা, মা!

পমি আস্তে আস্তে ডাকলে, মধুমতী, এখানে তোমার তো মা নেই!

ধড়মড় করে উঠে বসে মধুমতী কেঁদে ফেলে বললে, মা কোথায়?

—মা আছেন বাড়িতে।

—আমি বালি দাবো!

পমি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলো মধুমতী, তোমাকে বাড়িতে দিয়ে আসি। মধুমতীও উঠে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু পারলে না। কখনও তো তার অপথে-বিপথে এমন ভাবে হাঁটাহাটির অভ্যাস নেই, কালকের পরিশ্রমেই তার কচি কচি পা-দুখানি একেবারে টাটিয়ে উঠেছে। সে করুণ স্বরে বললে, আমি তলতে পারব না!

—চলতে পারবে না? তবে এসো দিদি, আমি তোমাকে কোলে করে নিয়ে যাই।

পমির কোলে উঠে মধুমতী দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরলে। পমি তাকে কোলে করে নিয়ে যাবে বললে বটে, কিন্তু মধুমতীর চেয়ে বড়ো হলেও সে-ও একরত্তি শিশু বই তো নয়! মধুমতীর ভারে একদিকে হেলে পড়ে টলমল পায়ে খানিক দূর এগিয়ে গিয়েই পমি বুঝতে পারলে যে, সে কী দুর্বহ ভার গ্রহণ করেছে। তার জোরে জোরে নিশ্বাস পড়তে লাগল, দম বেরিয়ে যায় আর কী!

সে নিশ্চয়ই আর বেশিদূর যেতে পারত না। এমন সময় দৈব হল তার সহায়। মাঠের উপর দিয়ে এক-কোঁচড় মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছিল একটি চাষার মতন লোক।

তাকে দেখে পমি দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ মশাই, এখানে রাজবাড়িতে যাবার পথ আছে কোথায় দেখিয়ে দিতে পারেন?

লোকটি প্রথমে অবাক হয়ে দুই শিশুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। এই বিজন মাঠে এমন দুটি সুকুমার দেবশিশু দেখবার আশা বোধহয় সে করেনি। তারপর জানালে, পথ খুব কাছেই আছে, সে দেখিয়ে দিতে পারে।

মধুমতী কান্নাভরা গলায় বলে উঠল, আমি খাবাল খাব! আমি মুলি খাব!

লোকটি একগাল হেসে বললে, খুকুরানি, তুমি মুড়ি খাবে? এই নাও! খোকাবাবু, তুমিও দু-মুঠো মুড়ি নাও! তোমরা বসে বসে খাও, আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে আছি।

পমির কোল থেকে নেমে পড়ে মধুমতী আঁচলের বদলে জামা পেতেই মুড়িগুলো নিলে। তারপর খুব তাড়াতাড়ি সব মুড়ি খেয়ে ফেলে সে বলে উঠল, আলো মুলি খাব!

পমি বললে, ছি মধুমতী, চেয়ে খেতে নেই!

লোকটি হাসতে হাসতে বললে, না খুকুরানি, তুমি যত পারো খাও। এই নাও। খোকাবাবু, তুমিও আর দুটো মুড়ি নেবে নাকি?

কালকের অনাহারের পর এই মুড়িগুলোকে বোধ হচ্ছিল অমৃতের মতন। আর কখনও মুড়িকে এত মিষ্টি লাগেনি। পমির মন তখন আরও কাঁড়ি কাঁড়ি মুড়ি চাইছে, কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটে সে কিছু বলতে পারলে না।

লোকটি বললে, ও, লজ্জা হচ্ছে বুঝি? লজ্জা কী, এই নাও।

তাদের আহার-পর্ব সমাপ্ত হল। পমি বললে, এইবারে আমাদের পথটা দেখিয়ে দেবেন? লোকটি বললে, দেব বইকি! এসো খুকুরনি, তোমাকে কোলে করে নিয়ে যাই। মিনিট ছয়-সাত পরেই তারা একটা পথের ধারে এসে পড়ল। তারপর মধুমতীকে কোল থেকে নামিয়ে লোকটি বললে, কেমন খোকাবাবু, এইবারে বাড়ি যেতে পারবে তো?

পমি বললে, পারব।

লোকটি চলে গেল। সে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর পমির মনে হল, মস্ত ভুল করে ফেলেছে। ওই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো জানতে পারা যেত, মধুমতীদের রাজবাড়ি কোন দিক দিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু আর সে ভুল শোধরাবার কোনও উপায় নেই। মধুমতীকে নিয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পমি ভাবতে লাগল, এখন তারা কোনদিকে যাবে? ডান দিকে না বা দিকে? এমন সময়ে দেখা গেল, একখানি ছাউনি-দেওয়া খালি গোরুর গাড়ি বা দিক থেকে এসে ডান দিকে যাচ্ছে।

পমি চেঁচিয়ে বলে উঠল, ও গাড়োয়ানভাই, ও গাড়োয়ানভাই! রাজবাড়ি কোন দিকে বলতে পারো ভাই?

গাড়োয়ান বললে, আমি তো সেইদিকেই যাচ্ছি খোকাবাবু!

পমি মিনতি ভরা কণ্ঠে বললে, গাড়োয়ানভাই, আমাদের পায়ে বড়ো ব্যথা হয়েছে, আমরা আর হাঁটতে পারছি না! তোমার গাড়িতে আমাদের তুলে নেবে?

মধুমতী ও পমির সুন্দর দু-খানি কচি মুখ দেখে গাড়োয়ানের প্রাণে বোধহয় দয়ার সঞ্চার হল। সে গাড়ি থামিয়ে নীচে নেমে পড়ে বললে, এসো খুকি, এসো খোকা, তোমাদের গাড়িতে উঠিয়ে দি।

তাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে নিজেও যথাস্থানে বসে গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা কোথায় যাবে?

পমি বললে, 'রাজবাড়িতে। গাড়োয়ানের চোখে-মুখে ফুটল বিস্ময়ের চিহ্ন। কিন্তু মুখে কিছু না বলে সে আবার গাড়ি চালাতে শুরু করলে।

গোরুর গাড়ি যখন রাজবাড়ির দেউড়ির ভিতরে ঢুকছে, তখন চারিদিকে উঠল বিপুল বিস্ময়ের কোলাহল! চারিদিক থেকে ছুটে এল দাসদাসী, দারোয়ান এবং আরও কত লোক। সকলেরই মুখে এক কথা, রাজকুমারী এসেছে। রাজকুমারী এসেছে। রাজকুমারী এসেছে। তারই জন্যে যে এই গোলমালের উৎপত্তি, এটা বুঝতে পেরে মধুমতীর আনন্দের আর সীমা রইল না। নিজের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে গোরুর গাড়ির উপরেই সে নাচতে নাচতে খিলখিল করে হাসতে শুরু করলে।

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে স্বয়ং রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায় ও রানি ললিতাসুন্দরী প্রাসাদের ভিতর থেকে দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

রানি দু-খানি ব্যগ্র বাহু বাড়াতেই মধুমতী মায়ের বুকের ভিতরে ঝাপিয়ে পড়ল। আনন্দের আবেগে রানির চোখ দিয়ে দর দর ধারায় অশ্রু ঝরতে লাগল!

রাজা বললেন, চলো রানি, আগে ভিতরে চলো, তারপর মধুর মুখে সব কথা শুনব।

ছাউনির ভিতরে চুপ করে বসে বসে পমি সব দেখতে ও শুনতে লাগল, কিন্তু তার দিকে কেউ ফিরেও চাইলে না। আর কোনওদিন মধুমতীর দেখা পাবে না বুঝে তার প্রাণটা কেমন হু হু করে উঠল।

মেয়েকে কোলে নিয়ে রানি কয়েক পদ অগ্রসর হয়েছেন, এমন সময় মধুমতী ব্যাকুল স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, থুপী! থুপী। আমাল থুপী কোতায়?

রাজা আশ্চর্য হয়ে বললেন, থুপী? থুপী আবার কে মধু?

মধুমতী আঙুল তুলে গোরুর গাড়িটা দেখিয়ে দিলে, তারপর আবার চিৎকার করে ডাকলে, থুপী?

ছাউনির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে পমি বললে, কী মধুমতী?

মধুমতী তার আধো আধো ভাষায় যা বললে তার অর্থ হচ্ছে এই, থুপীকে তার চাইই চাই। থুপীকে এখনই গাড়ি থেকে নেমে তার সঙ্গে বাড়ির ভিতরে আসতে হবে! নইলে সেও বাড়িতে যাবে না।

এই একটিমাত্র মেয়ে ছাড়া রাজার আর কোনও সন্তান নেই। কাজেই মধুমতীর সমস্ত আবদার ও হুকুম সর্বদাই তাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে হত।

রাজা গোরুর গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে বললেন, তুমিই থুপী?

পমি গম্ভীর ভাবে বললে, না, আমার নাম পমি।

—তবে থুপী কে?

—আমাকে ও-নাম দিয়েছে মধুমতী।

রাজা হো হো করে হেসে উঠে বললেন, মধুমতীর থুপী, তাহলে তুমিও গাড়ি থেকে নেমে আমাদের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে চলো!

পমির মুখে সমস্ত কথা শুনে রাজা বললেন, পমিবাবু, তুমি না থাকলে হয়তো আমার মধুকে আর ফিরিয়ে পেতুম না। মধুমতীকে হয়তো চোরে চুরি

করে নিয়ে যেত, নয়তো কোনও পাষণ্ড গয়নার লোভে তাকে খুন করে ফেলত। তুমিই তাকে রক্ষা করেছ। তোমার এ উপকার আমি জীবনে ভুলব না। কিন্তু তুমি কে বলো দেখি?

পমি তখন নিজের জীবন-কাহিনী রাজার কাছে বর্ণনা করলে–একেবারে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। সে কাহিনির ভিতর থেকে মোক্ষদা, যদুবাবু, বিন্দু, বনমালা–এমনকি নিমাই পর্যন্ত কেউ বাদ পড়ল না।

পমির দুর্ভাগ্যের ইতিহাস শুনে দয়ালু রাজার বুকটা ভরে উঠল দরদে। একটু ভেবে তিনি বললেন, পমিবাবু, আমার ইচ্ছা, মধুর খেলার সাথি হয়ে তুমি রাজবাড়িতেই থাকো। আমিও তোমাকে ছেলের মতন দেখব। কিন্তু মোক্ষদাদেবী হচ্ছেন তোমার অভিভাবিকা। তাঁর মত না নিয়ে আমি কিছুই করতে পারি না। আপাতত দিন-কয় তুমি এখানেই থাকো। তারপর তোমাকে নিয়ে আমি নিজে মোক্ষদাদেবীর কাছে যাব। দেখি, তিনি আমার মতে মত দেন কি না।

মোক্ষদার মন এই প্রথম নরম হল

সেদিন সকালে উপরের ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে বিন্দু যখন ফুলগাছে জল দিচ্ছিল, হঠাৎ দেখতে পেলে একখানা মস্ত বড়ো মোটরগাড়ি–এতবড়ো গাড়ি সে আর কখনও দেখেনি–

বিন্দু তো দস্তুরমোত হতভম্ব! মোক্ষদার বাড়ির সামনে মোটরগাড়ি কেউ কোনদিন দেখেনি।

তারপরই শোনা গেল জোরে কড়া নাড়ার শব্দ। মোক্ষদা নিজের ঘর থেকে বাজের মতন চেঁচিয়ে বললেন, বিন্দি! ওলো অ বিন্দুি! বলি, কনের মাথা খেয়েছিস নাকি? কে কড়া নাড়ছে শুনতে পাচ্ছিস না?

মোক্ষদার মধুর কণ্ঠস্বর শুনে বিন্দুর ভাবটা কেটে গেল। সে নেমে তার ঘরে ঢুকে বললে, আমাদের বাড়িতে মস্ত একখানা হাওয়া গাড়িতে চড়ে কে এসেছে! সেইই কড়া নাড়ছে।

মোক্ষদা অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, বাজে বকিস নে, পাগল হয়েছিস নাকি?

—আচ্ছা, কে পাগল, তা এখন বোঝা যাবে। এই বলে বিন্দু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মোক্ষদা েউঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, সত্যিই তাঁর সদরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড একখানা মোটরগাড়ি। এ যে অভাবিত ব্যাপার! মোক্ষদা অত্যন্ত বিপদগ্রস্তের মতন উত্তেজিত হয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

বিন্দু ফিরে এসে বললে, একটি ভদ্রলোক এসেছেন। তিনি তোমাকে এই কাগজখানা দিলেন।

বিন্দুর হাত থেকে ছোটো একখানা কাগজ নিয়ে মোক্ষদা পড়ে দেখলেন। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায় একটি বিশেষ দরকারে শ্রীমতী মোক্ষদাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে চান?

কাগজখানা পাঠ করে মোক্ষদার মাথা বন বন করে ঘুরতে লাগল। মোক্ষদা বুঝতে পারলেন না যে, তিনি পায়ের উপর না মাথার উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায়! কী সৌভাগ্য, কী সর্বনাশ! আমার বাড়িতে রাজা-রাজড়া! আমার সঙ্গে দেখা করতে চান রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায়?

মোক্ষদা ধপাস করে মাটির উপরে বসে পড়ে হাঁপরের মতন হাঁপাতে লাগলেন। বিন্দু ভয়ে চমকে বলে উঠল, কী হল গিন্নীমা, কী হল?

মোক্ষদা বললেন, ওরে বিন্দি, আমার বাড়িতে এসেছেন কোনও দেশের রাজা! আমি কি করব রে বিন্দি! কী পরে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াব? যা, যা, দৌড়ে চিরুনি আরশি সাবান নিয়ে আয়! শিগগির একখানা ভালো দেখে কাপড় এনে দে! বেশিক্ষণ বসে থাকলে রাজা বাহাদুর আবার চটে যাবেন। ওরে বিন্দি, এ আমার কী হল রে, আমি হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারছি না যে রে–যা, যা, শিগগির যা রে বিন্দি পোড়ামুখী!

মিনিট পাঁচ-সাত পরে পোশাক বদলে মোক্ষদা কাঁপতে কাঁপতে নীচের বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকে ভূমিষ্ঠ হয়ে রাজা বাহাদুরকে প্রণাম করলেন।

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ অল্প কথার মানুষ। তিনি প্রথমেই বললেন, মোক্ষদাদেবী, আপনিই তো পমির খুড়িমা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজামশাই।

—আমি যদি পমিকে মানুষ করবার ভার নি, তাহলে আপনার কিছু আপত্তি আছে কি?

মোক্ষদা অতিশয় বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি নেবেন পমির ভার!

—হ্যাঁ মোক্ষদাদেবী, তাকে আমি নিজের ছেলের মতন দেখব!

মোক্ষদার দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তার মাথা আবার ঘুরতে আরম্ভ করলে। তিনি কথা কইতে পারলেন না।

—বিলুন মোক্ষদাদেবী, আপনার মত কী?

—আমার আবার মত কী রাজামশাই? এ যে আমার মস্ত সৌভাগ্য!

—ধন্যবাদ মোক্ষদাদেবী, আপনার মত পেয়ে সুখী হলুম। হ্যাঁ, আর এক কথা, পমিবাবুর ইচ্ছা, বনমালাও তার সঙ্গে থাকে। আপনি কী বলেন?

ঠিক যেন আকাশ থেকে পড়ে মোক্ষদা বললেন, বনমালা!

—হ্যাঁ, সেই ছোট্ট মেয়েটি!

বিন্দু এতক্ষণ দরজার কাছে মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে ছিল। সেইখান থেকেই সে বললে, রাজাবাবু, বনমালাকে আমার বোনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। হুকুম পেলেই তাকে আমি নিয়ে আসব। আমার বোন এই পাড়াতেই থাকে।

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ বললেন, হ্যাঁ, তাকে এখনই নিয়ে এসো। বনমালা আমার সঙ্গেই যাবে।

বিন্দু অদৃশ্য হল। কিন্তু মোক্ষদার মনে হতে লাগল, তিনি যেন এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখছেন। বনমালা কে? রাজা বাহাদুর তাকে নিয়ে যেতে চান কেন? আর বিন্দুই বা তাকে চিনলে কেমন করে? এসব কী!

কিন্তু এসবের কোনও উত্তর পাবার আগেই রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ আবার বললেন, মোক্ষদাদেবী, পমি আমার গাড়িতেই আছে। আপনি কি তাকে দেখবেন?

মোক্ষদা বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ রাজামশাই!

একটু পরেই পমি এসে মোক্ষদাকে প্রণাম করে তার পায়ের ধুলো নিলে।

মোক্ষদা বললেন, দ্যাখো পমি, আমি তোমাকে বাইরে পাঠিয়েছিলুম বলেই আজ তোমার অদৃষ্ট ফিরে গেল।

—এবার থেকে ভালো হবার জন্য চেষ্টা কোরো। রাজামশাইকে দেবতার মতন ভক্তি কোরো।

—হ্যাঁ, খুড়িমা।

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো পমিবাবু,এইবারে আমরা গাড়িতে গিয়ে বসিগে।

রাজার সঙ্গে পমি সদর পর্যন্ত গিয়েছে, এমন সময় বনমালাকে নিয়ে বিন্দু এসে হাজির। বনমালার দেহখানি এখনও তেমনি ছিপছিপে আছে বটে, কিন্তু সে ফিরে পেয়েছে তার শ্রী। তার মাথার চুলগুলি হয়েছে চিকন, ডাগর চোখ দুটি হয়েছে উজ্জ্বল, গায়ের রং হয়েছে তাজা ও সুন্দর। তাকে দেখলেই ভালোবাসতে আর আদর করতে সাধ হয়।

আনন্দ ভরে তার হাত ধরে পমি বললে, বনমালা।

বনমালা লাজুক হাসি হেসে বললে, পমি! গাড়ির ভিতরে বসেছিল মধুমতী। সে ঝরনার মতন কলম্বরে হেসে উঠে দুটি হাত নেড়ে নেড়ে ডাকতে লাগল পমি আর বনমালাকে।

রাজা বললেন, চলো পমিবাবু, চলো বনমালা, মধু তোমাদের ডাকছে।

পমি আবার মোক্ষদার পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বিন্দু, তাহলে আমি আসি?

চোখের জল ঢাকবার জন্যে বিন্দু নিজের মুখে আঁচল চাপা দিলে। পমি ও বনমালা গাড়িতে উঠে মধুমতীর দুই পাশে গিয়ে বসল। মোক্ষদা বললেন, মনে রেখো পমি, ভদ্রলোকের ছেলের উচিত–

ভদ্রলোকের ছেলের পক্ষে যে উচিত কী, পমি তা শোনবার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিলে। গাড়ি যখন একটু এগিয়েছে পমি তখন ফিরে দেখলে, মোক্ষদা কাঠের মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তার পিছনে দেখা যাচ্ছে বিন্দুকে। সে তখনও মুখ ঢেকে কাঁদছে।